মাসুদ রানা

শয়তানের দূত

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা

শয়তানের দূত

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৭১

এক

'বিশ্রী ব্যাপার, খান,' এয়ারমার্শাল একটু অধৈর্য হয়েই বলে উঠলেন, 'রাডার রিপোর্ট ছাড়া আর কিছুই জানতে পারিনি আমরা। রাশান বা আমেরিকানদের শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন এয়ারক্র্যাফট আছে। কিন্তু শব্দের চেয়ে প্রায় এগারোগুণ স্পীড এটার। ঘণ্টায় সাত হাজার মাইল।'

আস্তে আস্তে পাইপে টোবাকো ভরছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। কাঁচা পাকা ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে রয়েছে। তিনজন পালাক্রমে দু'একটা কথা বলছে, সেদিকে খেয়াল নেই যেন।

'সেকেন্ড দুয়েকের জন্যে রাডার স্ক্রীনে ধরা পড়ে,' এয়ার কমোডোর বললেন। 'তারপরই নেই হয়ে যায়।'

এয়ারমার্শালের অপর সহচর মন্তব্য করল, 'জিনিসটার আকৃতিটাও পরিষ্কার না। কিম্ভূতকিমাকারই বলা চলে। প্রশ্ন হলো : শুধু আমাদের দেশের ওপর দেখা যাচ্ছে কেন ওটাকে?'

দেশলাইয়ের উপর থেকে একটা পিঁপড়ে নেমে গেল। দেশলাইটা তুলে নিয়ে পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন রাহাত খান। পুরানো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। এয়ারমার্শাল বললেন, 'সব তো শুনলে, খান···'

'ভুল,' বন্ধুকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন রাহাত খান।

এয়ারমার্শাল ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করলেন বন্ধুকে, 'কি ভুল, রাহাত?'

'শুধু আমাদের দেশে না, ইটালিতেও ধরা পড়েছে জিনিসটা। আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা—সব মহাদেশেই ধরা পড়েছে।' রাহাত খান পাইপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে বললেন, 'সবচেয়ে বেশি বার দেখা গেছে ইটালিতে আর আমাদের দেশে।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা হজম করে হাসলেন এয়ারমার্শাল, 'জানো তাহলে তুমি সব?' রাহাত খানের রিটায়ারের আগের কথা স্মরণ করলেন এয়ারমার্শাল। দু'জন দুই ফোর্সের হলেও বন্ধুত্ব ছিল দু'জনার, সে প্রায় আজ পনেরো বছর আগের কথা। তখন থেকেই দেখে আসছেন তিনি রাহাত খানের সর্বজ্ঞ হবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। 'সি. আই. এ; কে জি. বি; ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস; ইন্টারপোল রিপোর্ট পাঠিয়েছে। রুটিন রিপোর্ট।'

'আমি তোমার সাহায্য চাই। আমার চেয়েও বেশি জানো তুমি।' সিগার

ধরালেন এয়ারমার্শাল। 'ওভার-অল সিচুয়েশন সম্পর্কে তোমার কি বক্তব্য?'

'আমার এজেন্ট বাশার কাজ করছিল ওখানে।' রাহাত খানের কণ্ঠস্বর গম্ভীর শোনাল, 'মেসেজ পাঠাচ্ছিল, সাডেনলি ডেড হয়ে গেছে রেডিও। আবার পাঠাচ্ছি একজনকে। ওর কাছ থেকে শোনো।' ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন তিনি, 'নার্গিস? জিরো জিরো ডবল থ্রীকে পাঠিয়ে দাও। আর কফি দিয়ো। আমাদের জন্যে।'

কুড়ি সেকেন্ড পর নিঃশব্দে ঘুরে গেল দরজার নবটা। দরজা খুলে একপা একপা করে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল হলুদ রঙের আঁটসাঁট শিফন শাড়িতে মোড়া একটুকরো অগ্নিশিখা।

'এসো পরিচয় করিয়ে দেই,' ভরাট গুরুগম্ভীর গলা রাহাত খানের। 'এয়ারমার্শাল, ইনি ওঁর সেক্রেটারি, ইনি এয়ার কমোডোর সাজ্জাদ,' মেয়েটিকে দেখিয়ে এয়ারমার্শালের দিকে তাকালেন রাহাত খান, 'জিরো জিরো ডবল থ্রী, মিস সোহানা।'

করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল না সোহানা। টকটকে লাল ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম।'

গমগম করে উঠল রুমটা, 'বসো, সোহানা।'

আস্তে আস্তে হাতলবিহীন চেয়ারটায় বসে পড়ল সোহানা। আড়চোখে হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল। মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড হয়েছে। অগ্নিপরীক্ষা সবেমাত্র শুরু। কর্ণেন্দ্রিয় সদা সতর্ক হয়ে রইল পরবর্তী আদেশের জন্যে।

'ফাইল দেখে কি মনে হলো তোমার?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'সাবধানে এগোতে হবে আমাকে, স্যার,' মুখস্থ করা মতামতটা ধীরে ধীরে আওড়ে গেল সোহানা। এরকম একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তা বুঝে নিয়েছিল আগেই, 'অত্যন্ত শক্তিশালী সংস্থা না হলে এরকম এয়ারক্র্যাফট তৈরি করা সম্ভব নয়। যুগান্তকারী কয়েকটি আবিষ্কার দরকার হয়েছে এটা তৈরি করতে গিয়ে। যে-সব দেশ রিপোর্ট করেছে তারাও জড়িত থাকতে পারে এ ব্যাপারে।'

'জিনিসটা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' সোহানার দিকে ভাল করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এয়ারমার্শাল। কফির ট্রে নিয়ে রুমে ঢুকল নার্গিস।

'অসাধারণ স্পীডের জন্যেই রাডার ওটাকে অনুসরণ করতে পারে না,' শান্ত গলায় বলল সোহানা, 'ওটার বৈশিষ্ট্য এখানেই। রাডারকে ফাঁকি দেবার ক্ষমতা আছে বলে যে কোন টার্গেটে বিনা বাধায় বোমা ফেলতে পারবে। মিসাইল হার মানবে এর কাছে।'

সোহানা থামতেই এয়ার কমোডোর প্রশ্ন করলেন, 'অন্য কোন গ্রহ থেকে জিনিসটা পৃথিবীতে আসেনি তো? জিনিসটার আকৃতি অনেকটা গোল—সসারের মত। মঙ্গল গ্রহের প্রাণীদের তৈরি…'

এয়ারমার্শাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন সোহানার দিকে। উত্তর দিতে দ্বিধা করল না ও, 'কোন খেয়ালী প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর আবিষ্কার হতে পারে

জিনিসটা। ওঁদেরকেও মঙ্গলগ্রহের প্রাণী বলা যায়।'

'তোমার কাজ কি হবে ইটালিতে?' বিরক্তি প্রকাশ পেল রাহাত খানের গম্ভীর কণ্ঠে।

কফির কাপ সাজিয়ে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল নার্গিস।

একপর্দা নিচে নেমে গেল সোহানার গলা, 'ইটালির গারগানো ম্যাসিভে গিয়ে খোঁজ খবর নেয়া, স্যার। ওখানেই বেশি দেখা গেছে।'

'প্রথমে বাশারের সন্ধান নেবে। রিপোর্ট করবে ইমিডিয়েটলি। পাসপোর্ট পেয়ে যাবে ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার ফ্লাইটে যাচ্ছ তুমি। যাও।' সব কথা শেষ করে দূর হয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন রাহাত খান।

আস্তে আস্তে করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোহানা।

এয়ারমার্শাল বললেন, 'রোমে আমার লোক আছে। উইং কমান্ডার আফতাব। দরকার মনে করলে যোগাযোগ করতে পারেন আপনি। সাহায্য পাবেন।'

'ধন্যবাদ।' ঘুরে দাঁড়াল সোহানা।

'শোনো,' পিছন থেকে টান মারল ভারী গলা, 'আমারও একজন লোক আছে ওখানে। ছুটিতে আছে। ভেনিসে। শেষবার ওকে দেখা গেছে হোটেল আম্পালার ড্যান্স ফ্লোরে ছয়জন হিপি মেয়ের সাথে নাচতে। দরকার না পড়লে ওর সাহায্য চেয়ো না। এটা তোমার একার অ্যাসাইনমেন্ট। ওর নাম মাসুদ রানা।' এয়ারমার্শালের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কফির কাপে চুমুক দিলেন রাহাত খান।

দরজা অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে আসার সময় সোহানা শুনতে পেল রাহাত খানের মৃদু কণ্ঠস্বর, 'শি মে প্রুভ টু বি ওয়ান অভ মাই বেস্ট অপারেটরস্।' এয়ারমার্শালের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন তিনি, 'মেয়ে বলে কম মনে কোরো না তুমি ওকে···'

দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সব কথা শুনতে পেল না ও।

দুই

ভেনিসের গা ছুঁয়ে বয়ে চলেছে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পানি।

সেজেগুজে ঝলমলে সন্ধ্যা নেমেছে খানিক আগে। হোটেল আম্পালা। সিগারেটের ধোঁয়া, গ্লাসের টুং-টাং আওয়াজ, বিনয়ী বেয়ারাদের মৃদু পদশব্দ, ড্যান্সরুম থেকে ভেসে আসছে বাজনা আর যুবতী স্বর্ণকেশীদের ছোট ছোট হাসি, ফিসফিস করে সোহাগের কথা বলা—সব মিলিয়ে ভালই লাগছিল ওর।

ড্যান্সরুমে নাচের জাঁকজমক আসর বসেছে। হলরুমে সঙ্গিনীদের নগ্ন বাহুর নাচন, বুকের উচ্ছ্বাস আর নিতম্বের হিল্লোল দেখতে দেখতে যুবকেরা

পেরেশান।

আলো একটু বেশি উজ্জ্বল এখানে। কিন্তু তাতে কি। কেউ কারও দিকে ভুলেও তাকাবে না। সবাই যে যার মত ব্যস্ত।

হলরুমের সর্ব বাঁয়ে এখনও বসে রয়েছে চুপচাপ ইটালিয়ান লোকটি। একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে। ধরাবার ফাঁকে ফাঁকে প্রতিবার দেখে নিচ্ছে রানাকে।

সন্ধেটা মাঠে মারা যাবে আজ। গিয়াকোমা আসবে আটটায়। বাকি সময়টা অপূর্ব সুন্দরী দুই যুবতীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করার অভিনয় করে কাটাতে হবে তাকে। বিরক্ত হয়ে উঠছে রানা।

ইটালিয়ান আবার সিগারেট ধরাবার ফাঁকে রানার দিকে তাকাল। সঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পেল না রানা। লোকটা ওর ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে নজর রাখছে কিনা বলা মুশকিল। কোন কাজ নিয়ে আসেনি রানা। নির্মল ছুটি উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়েছে ও। আগামীকালই রোমের উদ্দেশে উড়বে পাখি। লোকটা জেলাস। দুই সুন্দরী যুবতী সাথে রয়েছে দেখে হিংসা হচ্ছে ব্যাটার।

গিয়াকোমার উপর রাগটা গিয়ে পড়ল রানার। ইটালিতে একমাত্র বন্ধু ওর গিয়াকোমা। প্লে-বয়। দেদার মদ গেলে, দু'হাতে টাকা ওড়ায়, নিত্য নতুন মেয়েকে নিয়ে রাত কাটায়, আর হঠাৎ ডুব মারে দীর্ঘদিনের জন্যে—ল্যাবরেটরিতে সারা রাত জেগে দিনের পর দিন গবেষণা করে ক্যান্সারের জীবাণু আবিষ্কারের নেশায়। প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হলে হবে কি, শিক্ষা নিয়েছে মিলিটারি একাডেমিতে। সেই সূত্রেই আলাপ হয়েছিল রানার সাথে। ও ইটালিতে পৌঁছে দেখা করতেই মুসলমানী কায়দায় কোলাকুলি করে খোশ আমদেদ জানিয়েছে গিয়াকোমা। পুরানো বন্ধুকে পেয়ে হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ্ হুররে করতে করতে রানাকে একান্তে টেনে নিয়েছে গিয়াকোমা। কিন্তু ক'দিন থেকে সন্ধ্যার পর বড় ব্যস্ত থাকে ও। ক্যান্সার সম্বন্ধে সেমিনার শুরু হয়েছে রোমে। রোজ চার্টার্ড প্লেনে যায় আর ফিরে আসে। মাঝখানের সময়টা রানা নিঃসঙ্গ থাকবে বলে ইটালির দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে গিয়াকোমা। ল্যাঠা এখন এখানেই। দুই কুমারীই প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ওর সাথে পরিচিত হয়ে। খানিক আগে পালাক্রমে নাচতে গিয়ে দু'জনাই নিজের নিজের বাড়িতে আজ রাতে ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে রানাকে।

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। ছ'টা পঁয়তাল্লিশ।

খট্-খট্-খট্-খট্…

হঠাৎ হাইহিলের শব্দ থেমে গেল। জোয়ানের হাত মুঠোর ভেতর ধরে সুয়ামার মুখের দিকে তাকিয়ে হস্তরেখার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছিল রানা। চোখ উঠে গেল হলের দরজার দিকে। কটমট করে রানার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাল টকটকে শাড়িতে মোড়া এক অপূর্ব অগ্নিশিখা।

সোহানা। অবাক চোখে তাকিয়ে রইল রানা।

খট্-খট্, খট্-খট্—আবার শোনা গেল হাইহিলের শব্দ। ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সোজা লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সোহানা। মুখে কথা সরল না রানার। লিফটের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল সোহানা।

'কে ওই মেয়েটি? তোমার চেনা?' হালকা গলায় প্রশ্ন করল সুয়ামা।

উত্তর দিল না রানা। দৃঢ় পদক্ষেপে হলরুমের দরজা অতিক্রম করে একটা লোক এগিয়ে আসছে। দীর্ঘকায়, প্রকাণ্ড কাঠামো শরীরের। দেহের তুলনায় মস্ত বড় একটা মাথা বসানো ঘাড়ে। ব্যাক ব্রাশ করা কোঁকড়া চুল। চোখ দুটো ঢাকা সান-গ্লাসে।

চেনে রানা। কিন্তু স্মরণ করতে পারছে না। দ্রুত অতীতের স্মৃতি ঘাঁটল ও। উঁহুঁ, মনে পড়ছে না কোনমতে। একে একে বন্ধুদেরকে স্মরণ করল। না, বন্ধুদের কেউ নয় এ লোক। শত্রু না মনে পড়ছে না। লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে হলরুম পেরিয়ে লিফটে গিয়ে চড়ল।

হঠাৎ মনে মনে উপলব্ধি করল রানা, এ লোক যে-ই হোক, আইনের ওপারের লোক, এপারের নয়।

'কি হলো তোমার?' এবার জোয়ানের প্রশ্ন।

'এক্সকিউজ মি,' উঠে দাঁড়াল রানা জোয়ানের হাত ছেড়ে দিয়ে, 'এখুনি আসছি আমি।' ম্যানেজারের চেম্বারের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল ও।

ম্যানেজারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে সোজা পে-বুদে ঢুকে পড়ল রানা। ঢোকার আগে হলরুমের বাঁ কোণে টেবিলের দিকে তাকাল একবার। ইটালিয়ানটা চোখ তুলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

রিসিভার তুলে ফোর্থ ফ্লোরে রুম নাম্বার ফোর হান্ড্রেড ফিফটির নির্দিষ্ট সংখ্যায় ডায়াল করল রানা। অপরপ্রান্ত থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কানের পর্দায় এসে আঘাত হানল—'হ্যালো?'

'কেমন আছ, সোহানা?' জিজ্ঞেস করল রানা, 'ইটালিতে...'

'কে আপনি? কাকে চান? রঙ নাম্বারে ডায়াল করেছেন...' সোহানার কণ্ঠে তিরস্কার।

'ঠাট্টা নয়, সোহানা। আমাকে তুমি দেখেছ হলরুমে।' রানা হাসল। 'কেমন আছি জিজ্ঞেস করলে না তো?'

'অপরিচিত কোন লোককে কুশল জিজ্ঞেস করা ভদ্রতা নয়,' সোহানার গলায় ঝাঁঝ, 'আমি রিসিভার রাখছি...

কিন্তু রিসিভার নামিয়ে রাখার আগেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল সোহানা। পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। কান থেকে রিসিভার নামিয়ে এক ঝটকায় পে-বুদের দরজা খুলেই সিঁড়ির দিকে ছুটল ও।

তিনটে করে সিঁড়ির ধাপ একসাথে টপকে তিনতলায় উঠে নিজের ভুল বুঝতে পারল রানা। লিফটে চড়লে তাড়াতাড়ি হত। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে পাঁচতলায় উঠে করিডর ধরে ছুটল ও। রুম নম্বার ফোর হান্ড্রেড ফিফটির দরজা বন্ধ। সজোরে ধাক্কা মারল ও। খুলে গেল দরজা। তালা খোলা ছিল দরজার। সিটিংরুম তিনলাফে পেরিয়ে বেডরু ম ঢুকে সোহানাকে দেখল

রানা। ক্রেডল্ থেকে মেঝের কাছে ঝুলে পড়েছে রিসিভারটা। চেয়ারের পেছনে মাথা এলিয়ে দিয়ে নিঃসাড় বসে আছে সোহানা। হাত দুটো ঝুলছে দু'পাশে।

পাল্স দেখে রানা বুঝল জ্ঞান হারিয়েছে সোহানা। আক্রমণের চিহ্নটা চোখ এড়াল না ওর। গলার চারপাশে আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে।

মিনিট তিনেক পর জ্ঞান ফিরে পেয়েই চোখ মেলে তাকাল সোহানা। সব কথা মনে পড়ে যেতে হতভম্ব হয়ে বিছানায় পড়ে রইল ও। জ্ঞান হারিয়েছিল সে চেয়ারের উপর, আর চোখে মুখে পানির ছিটেই বা দিল কে? উঠে বসতেই চোখাচোখি হয়ে গেল রানার সাথে। চেয়ারে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে ও। রানাকে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে আসতে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল সোহানা।

'পিছন থেকে আক্রান্ত হয়েছিলে তুমি?' বলল রানা। 'চিনতে পেরেছ লোকটাকে?'

'না,' সংক্ষিপ্ত উত্তর সোহানার। কাঁধের শাড়িটা খসে পড়েছিল, সেটা কাঁধে তুলে নিল ও। 'তোমার তাতে দরকার কি?' একটু কঠোর শোনাল সোহানার গলা, কিন্তু অভিমানের রেশটুকু কান এড়াল না রানার।

'কেন এসেছ ইটালিতে?' হাসল রানা। সোহানাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ও।

'তোমার সাথে দেখা করার জন্যে নিশ্চয় নয়।' ভ্যানিটি ব্যাগটা টেনে নিয়ে খুলে ফেলল সোহানা, 'কোন্ সাহসে হাতড়েছ আমার ব্যাগ?' ব্যাপারটা টের পেয়ে খেপে উঠল ও।

'সরি।' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করল রানা। 'ছুটিতে থাকলেও বহুদিনের অভ্যাসটা ছাড়তে পারিনি।' এবার সিরিয়াস হবার ভান করল ও, 'ব্যাপার কি খুলে বলো, সোহানা। কেন এসেছ, কে তোমাকে আক্রমণ করল?'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে না তোমার?' শান্তভাবে খোঁচা মারল সোহানা। 'দুইজনকে বসিয়ে রেখে এসেছ সে-কথা আমাকে দেখে ভুলে গেলে?'

'ওহ্-হো?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। সত্যি ভুল হয়ে গেছে বড়। 'ওরা কি যে ভাবছে...' মারাত্মক অন্যায় করে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

সোহানা মনে মনে দ্রুত চিন্তা করছে। সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে নাকি রানা? সে কি সীমা ছাড়িয়ে খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছে ওর সাথে? আরে, সত্যি সত্যি চলে যায় যে...।

'এই,' সোহানা বাধ্য করল নিজেকে কথা বলতে, 'শোনো।'

দরজার নব ধরে ঘুরে তাকাল রানা, 'আবার কি বলছ?'

'সত্যি চললে নাকি?' স্বাভাবিক গলা বজায় রাখছে সোহানা। মরে গেলেও রানাব কাছে মনের ভয়টা প্রকাশ করবে না সে। দাম বেড়ে গেছে ভেবে তাহলে মনে মনে লাফাবে ও।

'তোমার মন বড় সন্দেহপ্রবণ,' কঠোর সুর রানার।

'আর একটু থেকে গেলে পারতে না?' ওকে দরজার নব ঘোরাতে দেখে তাড়াতাড়ি বলল সোহানা।

'পারতাম। কিন্তু তার দরকার কি?'

'দরকার···দরকার,' কি বলবে বুঝতে পারল না সোহানা, তারপর বলে ফেলল, 'খানিকটা গল্প করে যেতে।'

'মিস সোহানা গল্প করার প্রস্তাব দিচ্ছে মাসুদ রানাকে। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। দরজা খুলে ফেলেছে ও।

'প্লীজ, রানা···,' সোহানার স্বর ভীতিবোধকে ঢাকতে পারল না। 'আমার ভয় করবে একা থাকতে।'

হা হা করে হেসে ফেলে দরজা বন্ধ করল রানা। খাটের উপর ফিরে এসে বলল, 'মেজর জেনারেল রাহাত খান ভাল এজেন্ট পাঠিয়েছেন। ভয়েই অর্ধেক কাবু হয়ে গেছে বেচারী।' সোহানার একটা হাত ধরে ফেলল ও। ঝট্ করে সেটা ছাড়িয়ে নিল সোহানা।

দেখতে দেখতে সোহানার ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেল। 'কে বলল বস্ পাঠিয়েছেন আমাকে?'

'অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আসোনি তুমি? অস্বীকার করতে পারবে?' অনুমানেই চ্যালেঞ্জ করল রানা।

'না, অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমার অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে তোমার কৌতূহলী হবার দরকার নেই। এটা আমার একার,' সোহানা যেন ঘোষণা করল, 'কাউকে নাক গলাতে দিচ্ছি না আমি।' বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, 'জানালার গ্রিল উঠিয়ে বাথরুম দিয়ে এসেছিল সম্ভবত লোকটা।' বাথরুমের দিকে পা বাড়াল ও।

'বেরিয়েও গেছে সেই পথে। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি,' মিটিমিটি হেসে বলে উঠল রানা। 'তোমার কাজটা আমিই সেরে রেখেছি। যাক, আজকে রাতে কোন প্রোগ্রাম আছে?'

'না,' চিন্তিত ভাবে বলল সোহানা।

'জ্যোৎস্না হবে একটু পর। নৌকা চড়তে বেরুবে?'

বাঁকা চোখে তাকাল সোহানা, 'তোমার সাথে? একা?'

'কেন আমি বাঘ, না ভাল্লুক?' মৃদু হাসি রানার ঠোঁটে।

'তুমি?' সোহানা মেপে মেপে খানিকটা হাসল, তারপর বলল, 'তুমি একটা এক নম্বরের ছোটলোক।'

রানা হেসে ফেলে বলল, 'ঠিক চিনেছ। হার্ট-কে হার্ট চেনে, বার্ড চেনে পাখি।'

কটমট করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সোহানা। তারপর পিছন ফিরে মন্থর পায়ে এগিয়ে গেল বাথরুমের দিকে।

তিন

হোটেল থেকে গ্র্যান্ড ক্যানেল মাত্র একশো গজ দূরে। সরু একটা শাখা বয়ে যাচ্ছে হোটেলের লেজ ছুঁয়ে।

গন্‌ডোলিয়ারের পরনে প্যান্ট শার্ট। গন্‌ডোলা কিন্তু দেখতে বাংলাদেশের ছইঅলা নৌকার মতই।

মোহনায় গন্‌ডোলা পড়তেই অকস্মাৎ এদের দৃষ্টি কেড়ে নিল দক্ষিণ কূলের প্রাচীন বাড়িগুলোর লাল-নীল সবুজ নিওন সাইনের আলো গায়েমাখা ছোট ছোট ঢেউগুলো। রানার হাত চেপে ধরল সোহানা, গন্‌ডোলা হঠাৎ দুলছে। রানা ইতালিয়ান ভাষায় বলল, 'আরও সামনে যেতে চাই আমরা। সান জিয়োরগিয়ো অবধি গিয়ে ফিরে আসব।' মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল গন্‌ডোলিয়ার।

উঁচু বেতের মোড়ার উপর বসে সোহানার দিকে তাকাল রানা। সোহানার এটা প্রথম সফর ভেনিসে। দর্শনীয় বস্তুগুলো আঙুল বাড়িয়ে দেখাচ্ছে রানা। ঢেউ যেমন হঠাৎ উঠেছিল, তেমনি হঠাৎ শুয়ে পড়েছে সটান। দূরে লঞ্চের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হয়তো তার ঢেউ এগিয়ে এসেছিল এদিকে। চাঁদটা ঢাকা পড়ে গেল ছোট একটা মেঘের আড়ালে। সাবলীল গতিতে এগোচ্ছে গন্‌ডোলা।

'কিছু বলছ না যে, সোহানা?' রানা সিগারেট বের করল পকেট থেকে।

সান্তা মারিয়ার সিঁড়ির ধাপগুলোকে অপর পারে রেখে সামনে এগোচ্ছে গন্‌ডোলা। চার্চটা অত্যন্ত বিখ্যাত। রানা হাত বাড়িয়ে দেখাল, 'ওই যে দেখা যাচ্ছে, ওটা ডগস্ প্যালেস, পিছনেই সেন্ট মার্কস ক্যাথিড্রাল।'

গ্র্যান্ড ক্যানেল অতিক্রম করে গভীর পানির দিকে এগোল ওরা। এদিককার পানি যেমন গভীর, তেমনি প্রশস্ত জায়গা নিয়ে বয়ে চলেছে। এই অংশটা দুই নদীর মোহনা, কিন্তু দেখে সহজে অনুমান করার উপায় নেই। কিছুটা যাবার পরই নদীর মুখ বেঁকে গেছে এদিক সেদিক।

গভীর জলের মাঝামাঝি জায়গায় গন্‌ডোলা পৌঁছুতে রানা সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি তো ভাল সাঁতার জানো না। গন্‌ডোলা যদি হঠাৎ ডুব মারে?' কথাটা শেষ করেই রানা দেখতে পেল গ্রে কেবিন ক্রুজারটা। গ্র্যান্ড ক্যানেলের উত্তরদিকের অন্ধকারে ছিল ওটা। দশ-বারো গজ দূর থেকে ওদের গন্‌ডোলা পাশ কাটিয়ে এসেছে ওটাকে। কিন্তু লক্ষ করেনি রানা। অন্ধকার বলেই তাকায়নি ওদিকে।

ইঞ্জিন চালু হয়েছে ক্রুজারের। রানা আবার তাকাল সোহানার দিকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘেদের ওড়া দেখছে ও।

'আমার কথার জবাব দিলে না যে? যদি ডুব দেয় গন্‌ডোলা?'

সোহানা অকারণ পুলকে হেসে উঠল, 'যদির কথা নদীতে ফেলো।'

'ঠাট্টা না, সত্যি যদি তেমন কিছু ঘটে?'

'স্রোতের টানে পারে গিয়ে উঠব, আবার কি?' বলল সোহানা। 'তবে তুমি মরবে। স্বীকার করছি মায়া হবে তোমার জন্যে। হাজার হোক, এতদিনের পরিচয়, ভালমন্দ কত কি বলেছি—গনডোলা ডুবে সলিল সমাধি লাভ করো তো কেমন করে চাই বলো। রিপোর্ট করব ঢাকায় ফিরে। বসের সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি করে রাজি করাব, রাজি না হলে ধর্মঘটের ভয় দেখিয়ে রাজি হতে বাধ্য করব তোমার একটা ছবি অফিসের দেয়ালে টাঙাতে। তারপর বছর শেষে চুনকাম করতে এসে মিস্ত্রীরা ছবিটাকে নামিয়ে ফেলবে ঝুল-কালি লেপটানো ফ্রেম দেখে। ঝেড়ে মুছে ফ্রেমটাকে আবার টাঙানোর কথা অফিসের কারও মনেই থাকবে না...'

রানা সোহানার একটি কথাও তখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না। হঠাৎ ওর অন্যমনস্কতা অনুভব করেই পিছন ফিরে তাকাল সোহানা। এবং আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

এক্সট্রা অর্ডিনারী ইঞ্জিন ক্রুজারটার। আগে থেকেই এগিয়ে আসছিল। টের পেয়ে গিয়েছিল রানা। মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল ও। হঠাৎ মৃদু গর্জন তুলে, কোন সিগন্যাল না দিয়েই, সবেগে ছুটে আসছে গভীর জলের দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে সোহানার একটা হাত ধরল রানা শক্ত করে। উঁচু ফেনিল ঢেউ তুলে ছুটে আসছে জলদৈত্য। গন্‌ডোলাকে রক্ষার সময় পেরিয়ে গেছে বুঝতে পারল রানা।

আঘাত লাগবেই। গন্‌ডোলিয়ারের মুখ দিয়ে স্প্যানডাউ মেশিনগানের মত সশব্দ গালি বেরুচ্ছে।

ঝট্ করে তাকাল সোহানা। চোখ দুটোয় পরিষ্কার আতঙ্ক। চাঁদের নিচে থেকে মেঘ সরে গেছে।

'এখুনি এসে পড়বে! কিন্তু আমি যে সাঁতার জানি না, রানা।'

'আমার সাথে লাফ দাও, সোহানা,' শান্ত গলায় কথাটা বলল রানা। পাঁচ সেকেন্ড অপেক্ষা করল ও। সোহানার হাতটায় চাপ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। সোহানা পানিতে লাফ দিয়ে অনুভব করল, ওর হাত ছেড়ে দেয়নি রানা।

ক্রুজারের উত্তাল তীব্র ঢেউ খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওদেরকে। প্রথম ধাক্কাতেই পনেরো গজের মত। জীবন বাঁচল ওদের। রবারের বলের মত ভেসে চলেছে ওরা। রানার বাঁ কাঁধ ধরে ভেসে আছে সোহানা। দু'জোড়া পা অনবরত ছুঁড়ছে ওরা। ক্রুজারের কাছ থেকে শ'খানেক গজ দূরে চলে এসেছে। ইঞ্জিনের শব্দ থেমে গেছে। আরও খানিকদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্রুজার।

গন্‌ডোলাটা দু'টুকরো হয়ে গেছে। কেমন করে যেন একটা অংশ উল্টে গিয়ে দুলছে ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে। গন্‌ডোলিয়ারের চিহ্ন নেই কোথাও। চমকে উঠে ক্রুজারের দিকে তাকাল রানা। ইঞ্জিনের শব্দ বাড়ছে আবার।

'শাড়িটা খুলে ফেলো, সোহানা,' সতর্ক গলায় বলল রানা। ক্রুজারটা

ফিরে আসছে গন্ডোলার দিকে। সাহায্য করবার জন্যে নয়, বুঝতে পারল রানা। আবার সেই তীব্র গতি এসে গেছে ওটার।

'ডুব সাঁতার দিয়ে বাঁচার চেষ্টা ছাড়া উপায় নেই আমাদের,' রানা বলল সোহানার দিকে তাকিয়ে। 'লজ্জা কোরো না, খুলে ফেলো শাড়ি। হালকা করে ধরে রাখবে তুমি আমাকে। পানির যতটা সম্ভব নিচে গিয়ে সাঁতরাব—ভয় নেই, আমি বাঁচলে তোমাকে নিয়েই বাঁচব।'

'শাড়ি আমি খুলে ফেলেছি, রানা,' সোহানা বলল।

হাসি পেল রানার এই বিপদের মধ্যেও। প্রাণের নাম বাবাজী, টান পড়লে সবকিছুতেই রাজি।

ভাসমান গন্ডোলাটার প্রায় কাছে পৌঁছে গেছে ক্রুজার। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ককপিটটা। দু'জন লোক ওখানে। একজন ক্রুজারের কন্ট্রোল অপারেট করছে। অন্যজন ভাসমান গন্ডোলাটা দেখার চেষ্টা করছে ঝুঁকে পড়ে। গন্ডোলার যাত্রীদেরকে খুঁজছে সে।

চিনতে ভুল করল না রানা। সোহানার পরপরই হোটেল আম্পালার হলরুমে ঢুকে লিফটে গিয়ে চড়েছিল এই লোক আজ সন্ধ্যায়।

লোকটা রানার পরিচিত। কিন্তু স্মরণ করতে পারছে না ও।

সোহানাকে নিয়ে ডুব সাঁতার দিয়ে ভেসে উঠল রানা। লোকটাকে আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে ককপিটে। এখনও খুঁজছে সে ওদেরকে। দাঁড়িয়ে পড়েছে আবার ক্রুজার। ডুব দিল ওরা। ডুব সাঁতার দিয়ে তীরের দিকে এগোতে এগোতে দ্রুত কাজ করছিল রানার মস্তিষ্ক। বারবার মনে পড়ছে অনীতার কথা। শেষবার ওকে হেলিকপ্টারে দেখেছে রানা। রানার পায়ের উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অনীতার দেহটা বাইরের নিশ্ছিদ্র, কালো অন্ধকারে। তীক্ষ্ণ একটা অপার্থিব চিৎকার উঠেই মিলিয়ে গেল। কিন্তু অনীতার কথা কেন মনে পড়ছে বারবার…ওর সেই অন্তিম চিৎকারটা এখনও কানে বাজছে রানার।

হঠাৎ পানির নিচে থেকে উপর দিকে উঠতে শুরু করল রানা। স্মরণ করতে পেরেছে ও। লোকটা সেই লোক না হয়েই যায় না। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? সমাধান পেয়েও স্বস্তি পেল না রানা।

অসম্ভব, অসম্ভব—কিন্তু স্বচক্ষে দেখেও অবিশ্বাস করে কি করে ও?

পানির নিচে থেকে মাথা তুলে কূল দেখতে পেল ওরা। 'রানা, আমরা বেঁচে গেছি এ যাত্রা,' চেঁচিয়ে উঠল সোহানা।

'কিন্তু ঢাকার অফিসে আমার ফটো ঝোলানোটা যে হলো না?' বলল রানা।

'ছবি আমি ঝুলিয়ে নিলাম…অন্য জায়গায়।'

বারের কোণায় টেবিলে বসেছে ওরা। সোহানা তাকিয়ে আছে রানার দিকে, দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়—'কি বলছ, রানা? তুমি কি পাগল হলে?'

'প্রথমে আমিও মেনে নিতে পারিনি, সোহানা,' ধীরে ধীরে বলল রানা।

'কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার করার পর অবিশ্বাস করার কিছু পাইনি।'

'কি করে বেঁচে রইল শয়তানটা? হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে পড়ে কেউ বাঁচে?'

'কপ্টারটা তখন কোথায় ছিল দেখার সুযোগ ঘটেনি। জ্ঞান ছিল না আমার। কতটা ওপরে ছিল তাও বলতে পারব না। বুড়িগঙ্গা কি শীতলক্ষার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে থাকতে পারে। কিংবা 'কপ্টার তখন এগারোতলা বিল্ডিঙের ঠিক ওপর দিয়ে যাচ্ছিল।' রানা বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল, 'এখন মনে পড়ছে লাফ দেবার খানিক আগে পিছন ফিরে নিচটা দেখে নিয়েছিল ও। বাঁচার উপযুক্ত জায়গা দেখে নিয়েই হয়তো লাফিয়ে পড়েছিল।'

'কিন্তু এ অসম্ভব, রানা!' সোহানা মেনে নিতে পারছে না কোনমতে।

হাসল রানা। 'অসম্ভব বলছ কেন? ভেবে দেখো, লাশ পাওয়া যায়নি ওর।' পর পর বিয়ারের গ্লাসে দু'বার চুমুক দিল ও। 'যাই হোক, আমি যাকে দেখেছি সে কবীর চৌধুরী ছাড়া আর কেউ নয়। যদি সে মরে গিয়ে থাকে তাহলে এ লোকটা তার ভূত।'

সোহানা প্রশ্ন করতে গিয়ে ক্ষান্ত হলো। রানা ভাবছে।

কূলে উঠে ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল সোহানা। শাড়ি নেই গায়ে, ব্লাউজটা বেখাপ্পা লাগছিল বড় বেশি।

কিন্তু কি আর করা। লজ্জার মাথা খেয়ে ব্লাউজ আর পেটিকোট পরেই রওনা হয় ওরা। পঞ্চাশ গজ হাঁটার পরই পাওয়া গেল ট্যাক্সি। ড্রাইভার প্রশ্ন করেনি কোন। হোটেলের পিছন দিকে গাড়ি থেকে ওদেরকে নামিয়ে দেয় সে। মাথা নিচু করে পা বাড়িয়েছিল সোহানা গেটের দিকে। যতক্ষণ না সুইটে ঢুকে বাথরূমে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল ততক্ষণ চোখ তুলে পলকের জন্যেও রানার দিকে তাকাতে পারেনি ও।

দু'জন শাওয়ার সেরে সোজা নিচে এসে বসেছে বারে। হলরূম হয়ে বারে ঢোকার সময় এবারও সেই হিংসুটে ইটালিয়ানকে দেখতে পেল না রানা। গন্‌ডোলা করে বেড়াতে বেরুবার আগে হলরূমে এসেছিল একবার রানা। লোকটা আছে কিনা দেখবার জন্যেই। ছিল না।

'কিন্তু কবীর চৌধুরী এখানে কেন, রানা?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

রানা চোখ তুলে তাকাল, 'আমারও সেই প্রশ্ন। কবীর চৌধুরী ইটালিতে কেন? কি ষড়যন্ত্র করছে ও ভেনিসে বসে?' সোহানার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল ও। 'আমার আরও একটা প্রশ্ন—তুমি এখানে কেন, সোহানা?'

'ভুলে যাও, রানা,' নীরস গলায় বলল সোহানা। 'আমার অ্যাসাইনমেন্টের কথা তোমাকে বলতে বাধ্য নই আমি। দিস ইজ অফিশিয়াল সিক্রেট। তাছাড়া তুমি এখন ছুটিতে। বাধ্য না হলে তোমার সাহায্য আমি চাইব না।'

'তথাস্তু।' হাসল রানা। 'আশা করি যখন আমার সাহায্য চাইতে বাধ্য বলে মনে করবে তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'ও কথা বোলো না।' সোহানা দ্বিধাগ্রস্ত। 'তোমাকে আমার ভয় হয়, রানা। তোমার কথা খেটে যায়, অনেক দেখেছি আমি। মনে আছে গন্‌ডোলায়

তুমি কি বলেছিলে?'

হেসে ফেলে রানা বলল, 'বোঝো তাহলে। আমার কথা ঠিক ঠিক ফলে যায়। সুতরাং বলে ফেলো তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য।'

খিলখিল করে হেসে উঠল সোহানা। মাথা নাড়া দিয়ে চুলগুলো পিছন দিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'চালাকি, না? আমার পেট থেকে একটা কথাও বের করতে পারবে না তুমি।'

গম্ভীর মুখে বলল রানা। 'বেশ, ভাল কথা।'

'রাগ করলে?' সোহানা দরদ দেখাবার ভান করল। 'রেগো না. আজ তোমাকে নতুন সম্মানে ভূষিত করব আমি। উপাধিটা একটা শব্দ—বীরপুরুষ।'

'কেন বলো তো?'

সোহানা হঠাৎ ঠাট্টা ভুলে গেল, নামিয়ে নিল চোখ জোড়া. চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর মৃদু গলায় বলল. 'তুমি এক আশ্চর্য মানুষ, রানা। তুমি না থাকলে আজ এতক্ষণ একটা লাশ হয়ে থাকতাম আমি। একদিনে আমাকে দু'বার বাঁচিয়েছ তুমি। তোমার পায়ের শব্দ শুনেই আমার রুম থেকে তখন পালিয়েছিল কবীর চৌধুরী। তুমি অদ্ভুত মানুষ. রানা।' সোহানার গলায় স্বীকৃতি।

অস্বস্তিবোধ করছিল রানা। কি যেন বলতে গিয়ে বলতে পারল না, তারপর গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'তখন তোমাকে কবীর চৌধুরীই আক্রমণ করেছিল ঠিকই বলেছ তুমি, সোহানা। দ্বিতীয়বারও ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদেরকে ডুবিয়ে মারতে চেষ্টা করল ও।'

'কিন্তু কেন, রানা?'

'জানি না,' অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল রানা।

চার

রানার সুইটে সিটিংরুমে বসে সকালের কফি পান করছিল ওরা। সোহানা নিজের সুইট থেকে এসেছে রানার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

স্নান করে সেজেগুজে এসেছে সোহানা। মেরুন রঙের শাড়িতে খুব সুন্দর মানিয়েছে ওকে। সদ্য ফোটা তাজা পদ্মফুলের মত লাগছে ওকে।

কফির পেয়ালা তখনও শেষ হয়ে যায়নি, পোর্টার একটা খাম দিয়ে গেল।

ছোট একটা চিঠি। গিয়াকোমা পাঠিয়েছে। খাম ছিঁড়ে ফেলল রানা।

'প্রিয়বরেষু,' গিয়াকোমা লিখেছে, 'এই মাত্র গত রাতের দুর্ঘটনার কথা শুনলাম আমি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমরা কোনও প্রকার আঘাত পাওনি। ক্রুজারটা আমারই বন্ধু সিজার মানাটোফের। ভুলবশত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে সে, ঘটনাটা সম্পর্কে তার নিজের বক্তব্য এটা। আমাকে সে অনুরোধ

করেছে তোমার সাথে তার দেখা করিয়ে দেবার জন্যে, যাতে স্বয়ং তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারে। আজকেই ওর ভেনিস ত্যাগ করার কথা, কিন্তু তোমার জন্য অপেক্ষা করতে চায় সে। তোমার সুযোগ মত আমাকে ফোন কোরো এ ব্যাপারে।

ওই গন্‌ডোলিয়ারের কোন সন্ধান নেই।

বন্ধু, গিয়াকোমা।'

'সিজার মানাটোফ?' রানার হাতে থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ে ফেলেছে সোহানা, 'কবীর চৌধুরীর ছদ্মনাম?'

'বিশ্বাস করি না। সরাসরি খুন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আমাদের মুখোমুখি হবে না কবীর চৌধুরী। মানাটোফ ওর সাঙ্গপাঙ্গ গোছের কেউ হবে। আমি ভাবছি মানাটোফের সাথে গিয়াকোমার বন্ধুত্বের কথা।' রানা চিন্তিত।

'গিয়াকোমা কেমন লোক?'

'সেজন্যেই অবাক হচ্ছি,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'দেখা যাক, এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি ওদেরকে।'

সোহানা প্রশ্ন তুলল, 'কিন্তু মানাটোফই যদি কবীর চৌধুরী হয়?'

'একবার না—দু'দু'বার যখন চেষ্টা করেছে, তখন তৃতীয় বারও চেষ্টা করবে সে পথের কাঁটা দূর করার। কি ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত এখানে জানি না। সম্ভবত সন্দেহ করেছে আমরা ওর পরিচয় জেনে ফেলেছি, তাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে খুন করার জন্যে। কিন্তু কবীর চৌধুরী যতই মরিয়া হয়ে উঠুক,' রানা হাসল, 'সে চেনে মাসুদ রানাকে। মাসুদ রানার হোটেল রূমে ঢুকে তাকে খুন করার কথা সে ভাবতে সাহস পাবে না।' বেডরূমে চলে গেল রানা গিয়াকোমাকে ফোন করার জন্যে।

ক মিনিট পরই সত্য বলে প্রমাণিত হলো রানার বিশ্বাস। সিজার মানাটোফ কবীর চৌধুরী নয়। লোকটার ভুঁড়ি আছে, সরু গোঁফ ঠোঁটের উপরে, গায়ের রঙ রোদে পুড়ে প্রায় তামাটে। পরিচয় পর্ব শেষ হতে রানা এবং সোহানার কাছে আনুষ্ঠানিক ভাষায় ক্ষমা চাইল সে। তারপর ব্যাখ্যা করল দুর্ঘটনার কারণ। সব দোষ চাপাল অ্যানগেলোর উপর। লোকটা নাকি কানে কম শোনে আর ঘটে মোটামুটি বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও খাটায় কম। প্রথমে অবশ্য মানাটোফ গন্‌ডোলাটাকে দেখতে পায়নি। দেখার পর সে অ্যানগেলোকে থামাতে বলে ক্রুজার। কিন্তু অ্যানগেলো ফুল স্পীডে সামনে বাড়তে থাকে। ফলে দুর্ঘটনাটা ঘটে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

মানাটোফ মিথ্যে কথা বলছে বুঝতে পারল রানা। ক্রুজারের ককপিটে দু'জন মাত্র লোক ছিল। একজন কবীর চৌধুরী। অ্যানগেলো অন্যজন। মানাটোফ ছিল না। কিন্তু প্রমাণ করতে চাইছে সে ক্রুজারে ছিল। ঘটনাটা কণ্ঠস্থ করে এসেছে আগাগোড়া কবীর চৌধুরীর কাছ থেকে শুনে।

সিগারেট অফার করল রানা ওদেরকে। গিয়াকোমা, মানাটোফ, দু'জনকেই একটা করে সিগারেট দিয়ে নিজেরটা মেঝেতে ফেলে দিল রানা। ঝুঁকে পড়ে সিগারেট তুলতে গিয়ে সোহানার সাথে চোখাচোখি হলো ওর।

সোহানার দৃষ্টি দেখেই মনোভাবটা বুঝে ফেলল রানা।

মানাটোফের গল্প অস্বীকার করে লাভ হবে না কিছুই। বরং গল্পটা বিশ্বাস করেছে ওরা একথা জেনে গিয়ে মানাটোফ কবীর চৌধুরীকে বললে মিথ্যে স্বস্তি পাবে সে। সোহানাও এই মতে বিশ্বাস করে। রানা ধন্যবাদ জানাল মানাটোফকে নিজে এসে ব্যাপারটা খোলাসা করার জন্যে। নিখোঁজ গন্ডোলিয়ারের জন্যে গিয়াকোমাকে একশো পাউন্ডের একটা চেক লিখে দিল রানা। মানাটোফ প্রতিশ্রুতি দিল সেও সমপরিমাণ টাকা গন্ডোলিয়ারের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবে।

কফি-পর্ব শেষ হবার পর গিয়াকোমা বলল, 'উঠি, রানা। ঘন্টাখানেক পর ইউরোপা বারে থাকব আমি। বেরুবে নাকি তোমরা?'

রানা বলল, 'ওদিকেই যাব আমরা। দেখা করব, যদি সম্ভব হয়।'

রানা আর সোহানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল ওরা। মানাটোফ যাবার সময় বলে গেল, 'আজই ভেনিস ছাড়ছি আমি। আবার দেখা হবে আমাদের।'

ওরা চলে যেতে রানা সোহানাকে বলল, 'হুমকি দিয়ে গেল মানাটোফ, বুঝতে পেরেছ?'

'আবার দেখা হবে বলল, তাই না?'

মাথা নাড়ল রানা। সোহানা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বেডরুমে ফোন বেজে উঠল। সোহানা উঠে গেল চেয়ার ছেড়ে।

পঁচিশ সেকেন্ড পর ফিরে এল সোহানা। রানার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই রুমের দরজার মাঝখানে। সোহানার সারামুখে কেউ যেন এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিয়েছে।

'পুলিস, রানা,' সোহানা নিচু গলায় বলল, 'ম্যানেজার তোমায় ডাকছে ফোনে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে বেডরুমের দিকে পা বাড়াল রানা, 'ভয় পেলে নাকি? ও কিছু না, রুটিন চেক।'

বেডরুমে ঢুকে তেপয়ের উপর থেকে রিসিভার তুলে নিল রানা, 'হ্যালো।'

'মি. মাসুদ রানা? পুলিস কমান্ডার মি. গ্যালিনি দেখা করতে চান আপনার সাথে।' ম্যানেজারের গলায় সতর্কতা, 'উপরে নিয়ে আসব ওঁকে?'

'অভকোর্স। প্লীজ ব্রিং হিম আপ অ্যাটওয়ান্স,' সহজ গলায় বলল রানা।

এক মিনিট পরই দরজায় টোকা পড়ল। 'প্লীজ কাম ইন,' রানা বলল।

সিটিংরুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল, লম্বা-চওড়া সুপুরুষ গ্যালিনি। ইউনিফর্মের সাথে বিভিন্ন ব্যাজ যুক্ত দেখেই বোঝা যায় পদস্থ পুলিস অফিসার সে।

'আপনাকে আর দরকার হবে না।' ম্যানেজারকে বলল গ্যালিনি। ম্যানেজার মাথা নেড়ে বিদায় নিতেই বাইরের দু'জন পুলিস দরজাটা বন্ধ করে দিল।

রানা বলল, 'বসুন, কমান্ডার।'

'থ্যাংক ইউ।' গ্যালিনি সরাসরি তাকাল রানার দিকে। 'আপনারা বড় রকমের একটা অন্যায় করেছেন, মি. রানা।'

রানা কথা বলতে গিয়ে বাধা পেল। হাত নেড়ে অফিসার থামিয়ে দিল রানাকে, 'শেষ করার সুযোগ দিন আমাকে। আপনারা গতরাতে এমন একটি ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন যার ফলে একজন ইটালিয়ান সিটিজেন মারা গেছে। এবং ঘটনাটা সম্পর্কে আপনারা নিকটস্থ থানা হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অপরাধ ঢাকায় এই উপায়কে কি নামে অভিহিত করতে বলেন আমাকে?'

আশা করেনি রানা। কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পারল ও। কবীর চৌধুরী পুলিস লেলিয়ে দিয়েছে। সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে শয়তানটা। রানা গম্ভীর হলো একটু। 'পরিষ্কার করে বলুন যা বলতে চান, কমান্ডার। আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

মুখের গাম্ভীর্য এতটুকু এদিক ওদিক হলো না গ্যালিনির। 'গতরাতে গ্র্যান্ড ক্যানেলের মোহনায় বেড়াতে গিয়েছিলেন আপনারা একটা গন্ডোলায় চড়ে। আপনি গন্ডোলা ভাড়া করার সময় তর্ক করেছিলেন গন্ডোলিয়ারের সাথে। আপনার বান্ধবী,' অফিসার সোহানার দিকে তাকাল, 'আপনি, মিস সোহানা, আপনার বন্ধুকে সিন ক্রিয়েট না করার অনুরোধ করে বলেছিলেন যে অত বেশি ড্রিঙ্ক করা উচিত হয়নি তোমার। গন্ডোলায় চড়েও গন্ডোলিয়ারের সাথে,' আবার ফিরে তাকাল রানার দিকে, 'আপনি তর্ক করছিলেন। গন্ডোলিয়ার এবং আপনি গ্র্যান্ড ক্যানেলের মোহনায় উত্তেজিত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলেন মুখোমুখি। সে-সময় একটি ক্রুজার ধীর গতিতে এগোচ্ছিল। তারপর আপনি হঠাৎ বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এবং গন্ডোলিয়ারকে আঘাত করার জন্যে হাত ওঠান। গন্ডোলিয়ার লাফিয়ে পড়ে পানিতে। ক্রুজারের সাথে ধাক্কা লাগে গন্ডোলার।' মুখস্থ বলে যাচ্ছে গ্যালিনি, 'আপনারা সাঁতরে তীরে ওঠেন। এবং নিরীহ গন্ডোলিয়ার, একজন ইটালিয়ান সিটিজেন, সলিল সমাধি লাভ করে। আরও পরিষ্কার করে বলবার দরকার আছে মি. মাসুদ?'

উত্তর দিতে দেরি করল না রানা। ভুল রিপোর্ট পেয়েছেন আপনি, কমান্ডার। আমি নেশাগ্রস্ত ছিলাম না এবং যা বললেন তা প্রমাণ করা সম্ভব নয় আপনাদের পক্ষে।'

'আপনার সাথে আমি একমত নই, মি. মাসুদ,' অফিসার দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'কারণ ছাড়া, প্রমাণ ছাড়া ইটালিয়ান পুলিস মুভ করে না।'

সোহানা কথা বলল এবার। 'কিন্তু কমান্ডার, আমার বন্ধু ড্রিঙ্ক করেনি। গন্ডোলিয়ারের সাথে ওর কোন ঝগড়াও হয়নি, ক্রুজারটাই আক্রমণ করেছিল আমাদের।'

'দুঃখের বিষয়, আপনার সাথেও একমত হতে পারছি না আমি।' অফিসার ঘড়ি দেখল, 'আমার সুপিরিওরদের বিবেচনাধীন কেস এটা, তাঁদের সিদ্ধান্তটা জানানো আমার কর্তব্য।'

'তাঁদের সিদ্ধান্তটা কি শুনি?' রানা খেপে উঠছে আস্তে আস্তে।

'আপনারা ভিজিটর হলেও ইটালির আইনের বাইরে নন। যদি অভিযোগ অস্বীকার করেন তাহলে গ্রেফতার না করে উপায় নেই আমাদের। শুনানির জন্যে আপনাদেরকে সময় মত হাজির করা হবে কোর্টে। সময় আগে থেকে জানাতে পারছি না আমরা। কোর্ট এখন ভীষণ ব্যস্ত। কম করে তিনমাস লাগবে সিরিয়াল অনুযায়ী বিচার হলে। তবে বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় একটা। ইটালি সরকার ভিজিটরদের যে সুযোগ দিয়ে থাকেন তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন আপনারা। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি ইটালিয়ান টেরিটরি ছেড়ে চলে যান তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেয়া হবে।'

গ্যালিনি থামতেই সোহানা বলে উঠল, 'আমরা কোন ঝামেলা করতে চাই না, রানা।'

গাম্ভীর্য টলে উঠল অফিসারের। সোহানা আর রানার আলাপের একটি বর্ণও বুঝতে পারল না সে। কিন্তু বাংলা ভাষার মিঠে উচ্চারণ কৌতূহলী করে তুলেছে তাকে।

'কি বলতে চাইছ?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'গ্রেফতার হতে চাই না আমি, রানা।' সোহানা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ইটালি পুলিসের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়লে ভণ্ডুল হয়ে যাবে ওর প্ল্যান। এমনিতেও যাবে, ইটালির বাইরে চলে যেতে হলে। কিন্তু পুলিস লেলিয়ে দেবার পিছনে কবীর চৌধুরী, না স্বয়ং ইটালি সরকার জড়িত তা জানা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। স্বেচ্ছায় বন্দী হবার চেয়ে ইটালির বাইরে গিয়ে মুক্ত থাকাটা অনেক কাজের হবে। সে কথাই আবার বলল সোহানা, 'আমার উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যাচ্ছে দু'ভাবেই, রানা। কিন্তু ইটালি সরকারের মুঠোয় পড়তে চাই না আমি। ওরা হয়তো আমার পরিচয় এবং উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরেই পিছনে লেগেছে। তোমাকে অবশ্য পরামর্শ দেবার আমি কেউ নই, অফিশিয়ালি। তবে বন্ধু হিসেবে বলব তুমিও রাজি হয়ে যাও ইটালি ত্যাগ করতে। কবীর চৌধুরীকে তুমি নাকানি-চোবানি খাইয়েছ, সুযোগ মত আবার ঘায়েল করতে পারবে তাকে। কিন্তু তার পরিকল্পনা মত সবকিছু ঘটতে দিলে হিতে বিপরীত হবে। আপাতত তার পথ থেকে তুমি সরে গেলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে। কিভাবে তাকে দমন করবে তা মুক্ত এলাকায় বসে চিন্তা ভাবনা করতে পারবে তুমি।'

সোহানার কথায় যুক্তি আছে। রানা দ্রুত ভাবছিল। এভাবে ভিজে-বেড়ালের মত লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতে ওর পৌরুষে লাগছে। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় কিছু করা ঠিক হবে না তাও সত্যি।

'আপনাদের মতামতের জন্যে আমি অপেক্ষা করছি, মি. মাসুদ।' নিস্তব্ধতা ভাঙল অফিসার।

জবাব দিল সোহানা। 'আমরা বরং ইটালি ত্যাগ করব কমান্ডার।' ক্রোধ ও ঘৃণা ফুটে উঠল ওর চোখেমুখে, কিছুই লুকোবার চেষ্টা করল না ও। 'আপনাদের আচরণে আমরা মর্মাহত। আশা করি আপনার ওপরঅলাদের

কথাটা জানাবেন। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা ইটালি ত্যাগ করব।'

'ধন্যবাদ, মিস সোহানা।' অফিসার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। 'বিদেশী অতিথিদের অ্যারেস্ট করা একটা জঘন্য কর্তব্য। আপনারা আমাকে রেহাই দিয়েছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের পাসপোর্ট, প্লীজ।'

কোন কথা বলল না রানা। সোহানা চলে গেল নিজের সুইটে। তিন মিনিট পর পাসপোর্ট নিয়ে এসে অফিসারের হাতে দিল ও। রানা আগেই দিয়েছে নিজেরটা। অফিসার দশ মিনিট পর ফিরে আসছে বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অফিসার বিদায় নিতেও কোন কথা বলল না রানা। ওর মনে খোঁচা মারছে শুধু একটি প্রশ্ন—সোহানা ভয় পেয়েছে—কেন?

কি অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছে সোহানা?

ইউরোপা বারে ভিড় দেখে সাবধান হয়ে গেল সোহানা। কবীর চৌধুরী শেষবার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থের চেষ্টা করলে অবাক হবার কিছুই নেই। রানার দিকে তাকাল ও। বোঝা গেল না কি ভাবছে রানা।

গিয়াকোমাকে ঘিরে রেখেছে একদল লোক। সবখানেই পরিচিত লোক থাকে ওর। রানাদের টেবিলে পৌঁছুতে আরও কুড়ি মিনিট দেরি হলো তার। চেয়ারে বসেই প্রশ্ন করল, 'আই ডোন্ট অ্যান্ডারস্ট্যান্ড, রানা। এমন তাড়াহুড়ো করে কর্তারা তোমাদেরকে বের করে দিচ্ছে কেন?'

'তুমি জানলে কি ভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

গিয়াকোমা খুলে বলল সব, 'তোমার কাছ থেকে বাড়ি ফেরার পরই ফোন করে আমাকে চীফ অভ পুলিস। অনেকদিন আগে পরিচয় হয়েছিল ভদ্রলোকের সাথে। আমাকে জিজ্ঞেস করল তুমি আমার বন্ধু কিনা। হ্যাঁ বলতেই বলল ব্যাপারটা জাতীয় স্বার্থের সাথে জড়িত সিনর গিয়াকোমা। আপনার বন্ধুর পিস্ অভ মাইন্ড যদি বজায় রাখতে চান তাহলে কোনরকম তৎপরতা না দেখিয়ে সীমানা অতিক্রম করার জন্যে পরামর্শ দিন তাকে। আমি বললাম—কিন্তু আমার বন্ধু সম্পর্কে আমিও কম জানি না। সে তার দেশের একজন সম্মানিত নাগরিক। এতে চীফ জানাল তাদের ইনফরমেশন নাকি সম্পূর্ণ উল্টো আর সিক্রেট। এর পরপরই ফোন ছেড়ে দেয় ভদ্রলোক।'

গোটা পৃথিবীতে এক ডজনেরও কম লোক জানে রানার আসল পরিচয়। গিয়াকোমাও জানে না। জানে কবীর চৌধুরী। কবীর চৌধুরী পুলিসকে জানিয়ে দিয়েছে যা জানাবার। দ্রুত চিন্তা করছিল রানা। হঠাৎ প্রশ্ন করল ও, 'মানাটোফকে কতদিন থেকে চেনো তুমি, গিয়াকোমা?' সবটা জানতে চায় ও, 'কি জানো ওর সম্পর্কে?'

'খুব বেশি দিনের পরিচয় নয় ওর সাথে। আমাদের ইয়ট ক্লাবের মেম্বার। দু'একবার ব্রিজও খেলেছি। খুব ধনী লোক। বারলেটায় বসবাস করে। ইটালির দক্ষিণে, অ্যাপুলিয়ায়। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবসা করে। একটা ফ্যাক্টরি আছে, এয়ারক্র্যাফটের পার্টস তৈরি করে। মোটামুটি এই জানি।'

গিয়াকোমা রানার গাম্ভীর্যে রীতিমত বিস্মিত হয়েছে। 'কি ব্যাপার, রানা? কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না আমার। খুলে বলতে আপত্তি আছে?'

রানা তাকিয়ে রইল গিয়াকোমার দিকে কয়েক সেকেন্ড। তারপর সোহানা আর নিজের পাসপোর্টটা পকেট থেকে বের করে বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

পাসপোর্টের উপর অ্যাডিশনাল এন্ট্রিতে লেখা : পারমিশন টু সারকুলেট অন ইটালিয়ান টেরিটরি ইজ উইথড্রন উইথ এফেক্ট ফ্রম মিডনাইট অন টুয়েনটি ফিফথ ইনস্ট্যান্ট। টানা হাতের লম্বা একটা সই নিচে, বড় একটা সীলের উপর। গিয়াকোমা চোখ তুলে বলল, 'দ্যাটস অফিশিয়াল, অল রাইট।' একটু হাসল ও, আশ্বস্ত করতে চাইল রানাকে, 'অবশ্য দুশ্চিন্তা কোরো না তোমরা। ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে দেখছি আমি। ক্রিমিন্যালদের মত দেশ থেকে বেরিয়ে যাবে তোমরা—অসম্ভব, আমি তা হতে দিতে পারি না।'

'না, মি. গিয়াকোমা,' এতক্ষণ পর কথা বলল সোহানা, 'আমরা নিজেদের স্বার্থেই বর্ডার ক্রস করব।'

রানা বলল, 'সব কথা বলা যাবে না, গিয়াকোমা। দুঃখিত। এ ব্যাপারে তোমার করার কিছুই নেই। আমরা খানিক পরই রওনা হচ্ছি ব্রেনার পাসের উদ্দেশে।'

গিয়া'কামা স্বদেশ থেকে বন্ধুকে এমন জঘন্যভাবে বের করে দেয়া হচ্ছে দেখে লজ্জায় দুঃখে চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। নানা ভাবে ওর মনের ক্ষোভ দূর করতে চেষ্টা করল রানা। আধঘন্টার মত গল্প করে বিদায় নিল ওরা। গিয়াকোমা কথা বলতে পারল না ভাল করে। আঘাত পেয়েছে লোকটা রানাকে এভাবে বিদায় নিতে হচ্ছে দেখে।

হোটেল আম্পালা থেকে নিচে নামল ওরা সাড়ে চারটের দিকে। রানার গাড়ি বেন্টলীতে ব্যাগ তুলে দিয়ে গেছে পোর্টার আগেই।

ভেনিস থেকে রাস্তাটা মেসট্রির মেনল্যান্ডে গিয়ে মিশেছে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে ড্রাইভ করল রানা। পরাজয়ের অনুভূতিটা নিষ্কৃতি দিচ্ছে না ওকে। অতি সহজে হার স্বীকার করেছে ও। সোহানাকে কথাটা ও বলেই ফেলল, 'আর একবার ভেবে দেখো, সোহানা। কবীর চৌধুরী কি ষড়যন্ত্র করছে তা না জেনেই পালাচ্ছি আমরা।'

সোহানার কোন দ্বিধা নেই, 'পালাচ্ছি কে বলল? আপাতত ক্ষমা করে দিয়ে যাচ্ছি শয়তানটাকে। কবীর চৌধুরী কি ষড়যন্ত্র করছে তা আমরা জানবই। এখানেই ক্ষান্ত দিচ্ছি না আমরা।' সোহানা হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল, 'আমরা না বলে ''আমি' বলাই ভাল। তুমি তো ছুটিতে।'

'কবীর চৌধুরী বেঁচে থাকতে আমার ছুটি নেই। ছুটি ক্যান্সেল করে দিয়েছি আমি।' রানাকে সত্যি সত্যি কঠোর মনে হলো সোহানার।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। গত কয়েক ঘণ্টায় অনেকগুলো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

রাত কাটাবার জন্যে ভেরোনাতে থামবে ঠিক করেছে রানা। সময়-সীমা

থাকতে থাকতেই ওখান থেকে বর্ডার পার হয়ে ইটালি ছাড়া যাবে অনায়াসে। ইনসব্রুক থেকে বর্ডার পঁচিশ মাইল মাত্র। ইনস্ব্রুককেই সোহানাকে নিয়ে উঠবে ও।

ভাইসেন্জার কাছাকাছি এসে রানা গাড়ির গতি কম করল আরও খানিকটা। দশ মাইল আগে থেকেই স্পীড ক্রমশ কমিয়ে আনছে ও।

সোহানা নিস্তব্ধতা ভাঙল হঠাৎ. 'ওরা কারা, রানা?'

'জানি না.' স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে বলল রানা, 'তবে ভাই-বেরাদার কেউ নয়।'

রীয়ার উইন্ডো দিয়ে আরেকবার পিছনে তাকাল সোহানা। প্রায় মাইল খানেক রাস্তা সোজা সমতল পড়ে রয়েছে পিছনে। খুব কম ট্রাফিক। সিকি মাইলের চেয়েও কম দূরে রয়েছে স্পোর্টস্ স্যালুনটা। লেটেস্ট মডেল। ভারী বেন্টলীর চেয়ে শক্তিশালী তাতে সন্দেহ নেই। ভাইসেন্জারের ভেতর দিয়ে যাবার সময় গাড়িটা আরও নিকটবর্তী হলো। একটা ইন্টার-সেকশনের কাছে আলফা-রোমিও বাধ্য হলো বেন্টলীর পিছনে থামতে। সোহানা দেখল চারজন প্যাসেঞ্জার গাড়িটায়। ধোপ-দুরস্ত পোশাক পরা সাধারণ ইটালিয়ান ব্যবসায়ী-দের মত হাবভাব। নাম্বার প্লেট দেখে একটু অবাকই হলো ও। বারীতে রেজিস্টার করা গাড়ি। বারী ইটালির অপর প্রান্তের কাছাকাছি একটি বড় শহর। অনেক দূর পাড়ি দিয়েছে গাড়িটা। কিন্তু অনুসরণ করছে কেন ওরা?

ভেরোনা পেরোবার সময় মাত্র কয়েক গজ পিছনে লেগে রইল আলফা-রোমিও। ঘন্টায় একশো মাইল বেগে ছুটছে দুটো গাড়ি। আলফা-রোমিওকে খসাবার কোন চেষ্টা করল না রানা।

ছ'টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি থাকতে ভেরোনার বাইরে এসে পড়ল গাড়ি। ভেরোনায় রাত কাটাবার কথা, কিন্তু থামল না রানা। টেরেন্টোর মেন রোড বেছে নিল ও। সিটির টাউন কন্ট্রোল পয়েন্ট অতিক্রম করার সময় মাত্র পাঁচ ছয় গজ পিছনে দেখা গেল আলফা-রোমিওকে। N 12 এ উঠে এল রানা গাড়ি নিয়ে। ইটালি থেকে অস্ট্রিয়া এবং ওয়েস্ট জার্মানী যাবার জন্যে N 12 প্রধান রাস্তাগুলোর অন্যতম। হাইওয়েতে উঠে ভেনিস ছাড়ার পর এই প্রথম বেন্টলীর তীব্রগতি কাজে লাগাল রানা। এদিকের রাস্তাঘাট ভালভাবে চেনে ও। একটা প্ল্যান করে নিল মনে মনে। ছোটখাট শহর ডোমেগলায়ারায় পৌঁছুবার পর ও যদি হঠাৎ সাইড টার্ন নিতে পারে তাহলে আলফা-রোমিওকে আধমাইল পিছনে রেখে ভেরোনায় অনায়াসে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু রেলওয়ে ক্রসিং-এর কথা ভাবেনি রানা। প্রথম দুটো খোলা পেল। আশি মাইল স্পীডে পেরিয়ে গেল ও। মোড় নেবার পর এক কিলোমিটারের মধ্যে আর একটা লেভেল ক্রসিং। গেট বন্ধ। নিরুপায় হয়ে বেন্টলী দাঁড় করাল রানা। স্পোর্টস স্যালুন আলফা-রোমিও সজোরে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল পাশেই। চারজন প্যাসেঞ্জারের কেউই ফিরে তাকাল না ওদের দিকে। যেন কিছুই ঘটেনি।

ট্রেন চলে যেতে গেট উঠে গেল উপরে। রানা দাঁড় করিয়ে রাখল গাড়ি।

পিছন থেকে হর্ন বেজে উঠল তিন-চারটে গাড়ির। কিন্তু আলফা-রোমিও স্টার্ট নিল না। আধ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে বাধ্য হয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। স্টার্ট নিয়ে পিছু ধরল আলফা-রোমিও।

পরবর্তী বড় শহর টেরেন্টো। সোহানা বলল, 'বোঝা গেল ব্যাপারটা। কোনমতেই হারাতে চায় না ওরা আমাদেরকে। ভাবছি থামবার পর কি ঘটবে। ভেবে কিনারা পাচ্ছি না কেন অনুসরণ করছে ওরা।' হাসল ও 'শেষ পর্যন্ত কোথায় থামব আমরা তা জানার জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করেছে বেচারারা। রানা, আমি বিশ্বাস করি না ওরা পুলিসের লোক কবীর চৌধুরীরই লোক এরা।'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'আমরা ইটালি ত্যাগ করছি সে ব্যাপারে ডেফিনিট রিপোর্ট চায়।'

টেরেন্টো পৌঁছে গাড়ির গতি কমাতে হলো। আঁকাবাঁকা রাস্তা, একপাশে রেল লাইন, অপর পাশে নদী। সন্ধেটা চমৎকার। গাছে ফুল ফুটেছে। চাঁদ ওঠেনি, তবে তারার সমাবেশ আকাশ জুড়ে। এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে ভাবতে অবাক লাগে যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু'বার ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল ওদেরকে।

শহরের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছুল বেন্টলী। এ শো কুড়ি মাইল দৌড়েছে গাড়িটা। এরপর স্নান ও পান করার কল্পনা নিতান্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠল সোহানার মনে।

লেক গারডা এবং ব্রেসিয়ার মধ্যবর্তী রাজপথের উপর হোটেল একসেলশিয়র। এদিককার অন্যান্য হোটেলের মতই গ্যারেজটা হোটেলের পিছন দিকে।

হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। গাড়ি থেকে নেমে বলল, 'বসো তুমি। রুম খালি আছে কি না দেখি। রিভলভারটার কথা স্মরণ রেখো। আলফা-রোমিও ইচ্ছা করে পিছনে রয়ে গেছে বলে আমার বিশ্বাস। আধমিনিটের ভেতর পৌঁছে যেতে পারে।'

সোহানার কানে সব কথা ঢুকল না। হ্যান্ডব্যাগ খুলে মেকআপ ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত ও।

রানা সুইং ডোর ঠেলে হোটেলের ভিতর ঢুকতেই হল-পোর্টার মুখ তুলে তাকাল, 'গুড ইভনিং, স্যার।' ইংরেজিতে ওইটুকুই দৌড় তার, আঙুল বাড়িয়ে ডেস্ক ক্লার্কের দিকে এগোতে বলল সে রানাকে।

হোটেলের সামনের দিকে গাড়ি না দেখে বোর্ডার প্রায় নেই বুঝে নিয়েছে রানা। ক্লার্ককে রুমের কথা জিজ্ঞেস করতে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে ওর দিকে। অপ্রত্যাশিত গেস্ট দেখে ইতস্তত করছে লোকটা। খবর না দিয়ে গেস্ট বড় একটা আসে না এদিককার হোটেলে। রানা রিপিট করল রুমের কথা। ক্লার্ক চার্ট খুলে চোখ বুলাতে শুরু করল। খানিকপর মাথা তুলে জানতে চাইল, 'ক'টা রুম দরকার আপনার, স্যার?'

'দুটো বেডরুম।'

'আপনি এশিয়ান, স্যার?'

'ও ইয়েস।' বিরক্ত হলো রানা।

'আসল কথা আমাদের হোটেল এখনও ফুল স্টাফ নিয়ে চালু হয়নি।' ক্লার্কটা ঠিক কি বোঝাতে চায় ধরতে পারল না রানা।

'রুম হবে, না হবে না?' সরাসরি প্রশ্ন করল রানা।

'এখুনি আপনাকে জানাতে পারব বলে আশা করি, স্যার। ম্যানেজারের সাথে আমি আলাপ করে আসছি।' ক্লার্ক উঠে দাঁড়াল। 'আপনার নামটা, স্যার?'

'মাসুদ রানা।'

'দুটো বেডরুম কেন দরকার?'

লোকটার ব্যবহারে রীতিমত চটে উঠল রানা। কিন্তু কিছু বলবার আগেই 'ম্যানেজার' লেখা দরজাটা খুলে গেল ঝট্ করে। একজন লোক আধা ছুটন্ত ভাবে এগিয়ে এল ওদের দিকে। রানার দিকে দৃষ্টি তার। 'আপনার নাম মি. মাসুদ রানা?'

রানা ভ্রূ কুঁচকে দেখল লোকটাকে। 'কেন?'

'এক্সকিউজ মি, স্যার, ইংলিশ কারটা সম্ভবত আপনার?' ম্যানেজার শঙ্কিত, 'একজন মহিলা, সম্ভবত আপনার স্ত্রী ছিলেন ওটায়?'

'হ্যাঁ—কি হয়েছে?' রানা দ্রুত চিন্তা করার চেষ্টা করছে। সুইং-ডোর দিয়ে সোজা বাইরে তাকাল রানা। বেন্টলী নেই বাইরে।

'ব্যাপারটা কি?' দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল রানা অধৈর্যভাবে।

'আপনার স্ত্রী সম্ভবত ইনএক্সপেরিয়েন্সড ড্রাইভার। কি কারণে ঠিক জানি না, গাড়িটা উনি হোটেলের সামনে থেকে গ্যারেজের দিকে নিয়ে গেছেন। আপনি জানেন গ্যারেজ পিছন দিকের বেসমেন্টের সাথে?'

ধমকে উঠল রানা, 'বাজে কথা বাদ দিয়ে কি হয়েছে বলুন।'

'ছোটখাটো একটা দুর্ঘটনা হয়েছে, স্যার। সিরিয়াস কিছু না অবশ্য। কিন্তু আপনি যদি একবার দেখেন স্বচক্ষে...'

রানা পা বাড়িয়ে দিয়েছে ততক্ষণ। ম্যানেজার বলে উঠল, 'এদিক দিয়ে তাড়াতাড়ি হবে, স্যার। আমার সাথে আসুন।' 'SERVIZIO লেখা দরজাটা দেখিয়ে দিল ম্যানেজার। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল রানা। সামনেই সিঁড়ি।

'সিঁড়িটা সোজা গ্যারেজে গেছে...'

রানা দৌড়ল। ম্যানেজার দ্রুত অনুসরণ করল তাকে। কিন্তু পিছিয়ে পড়ল সে বেশ খানিকটা। ডান দিকে দু'বার বাঁক নিল সিঁড়ি। শেষ ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছে গ্যারেজের প্রসারিত জায়গাটা চোখে পড়ল রানার। এদিক ওদিক তাকাল ও। সোহানা বা বেন্টলীর কোন চিহ্ন নেই কোথাও। ম্যানেজারের দিকে তাকাবার জন্যে ঘাড় ফেরাল ও। কিন্তু তার আগেই পিছন থেকে মৃদু একটা শব্দ হলো।

আঘাতটা অসহ্য, টের পেল রানা সেই মুহূর্তে। কষ্ট বা ব্যথা কোনটাই ভোগ করতে হলো না ওকে। কংক্রিটের মেঝের উপর পড়ে গেল শরীরটা

নিজের অজ্ঞাতে। কপালের পাশে প্রচণ্ড এক আঘাত খেয়েই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল রানা।

'দারুণ, স্টেফানো।' অপেক্ষাকৃত লম্বা ইটালিয়ান বাহবা দিল স্টেফানোকে, 'এক ঘুসিতেই কাত করে দিয়েছ। গাড়ির বুটে রেখে এসো ওকে। না, আসার দরকার নেই, পালাও তোমরা। কিন্তু সুন্দরী যেন বুঝে না ফেলতে পারে, সাবধান। উগো আর আমি থাকছি।' ম্যানেজারের দিকে তাকাল লোকটা, ডেস্ক ক্লার্ক আর হল পোর্টারও আছে সেখানে। 'মনে থাকবে তো যা বলেছি? চীফ অভ সিকিউরিটি পুলিসের স্পেশাল বাহিনীর লোক আমরা। যে লোকটাকে নিয়ে যাচ্ছি সে বিদেশের দুর্ধর্ষ একজন স্পাই। জাতীয় স্বার্থ জড়িত এ ব্যাপারে। সুতরাং মুখ খোলা চলবে না। এমন কি আঞ্চলিক পুলিস এলেও আমাদের কথা উল্লেখ করা নিষেধ। আপনারা একেবারে কিছুই জানেন না। কোন বিদেশী আপনাদের হোটেলে আজ ঢোকেইনি। মনে থাকবে?' গম্ভীর এবং কঠোর কণ্ঠস্বর লোকটার। স্টেফানো রানার অচেতন দেহটা নিয়ে চলে গেল গ্যারেজের বাইরে।

ম্যানেজার হাত কচলাতে কচলাতে অতি কষ্টে হাসল, 'থাকবে স্যার, অবশ্যই মনে থাকবে।'

'দেখবেন, আপনার কর্মচারীরা যেন ভুল-ত্রুটি করে না বসে।'

'না, স্যার। ওদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি। আর একবার ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে নেব।'

লোকটার গাম্ভীর্যে এতটুকু রদবদল হলো না। 'তাহলেই ভাল। কোনরকম গোলমাল কোথাও যদি করে ফেলেন পরিণতির জন্যে সিক্রেট পুলিস দায়ী থাকবে না।' দৃঢ় পদক্ষেপে সিঁড়ির ক'টা ধাপ অতিক্রম করে গ্যারেজের দিকে নেমে গেল লোকটা।

ম্যানেজার বাকি দু'জনকে নিয়ে হলরুমে ফিরে এল। পাঁচ মিনিট ধরে বোঝাল সে পোর্টার আর ডেস্ক ক্লার্ককে। পোর্টার কথা বলে উঠল মাঝখানে, 'স্যার, ওই যে, ভদ্রমহিলা এদিকেই আসছেন।' চকিতে তাকাল সে হোটেলের সুইং-ডোরের দিকে।

তিনজন লোক যে-যার জায়গার দিকে দ্রুত পা বাড়াল। ম্যানেজার থমকে দাঁড়াল তাঁর চেম্বারের দোরগোড়ায়। ঘাড় ফিরিয়ে বাকি দু'জনার দিকে তাকাল সে। 'মনে থাকে যেন,' নাটকীয় ভাবে বলল সে, 'আমরা কিছুই জানি না—কিচ্ছু না।'

মেকআপ ঠিক করার ফাঁকে হোটেলের সুইং-ডোর ঠেলে রানাকে ভিতরে ঢুকতে দেখেছিল সোহানা। কয়েক সেকেন্ড পর গাড়ির পিছন দিকে তাকাল ও। ক্রমশ নিচু গ্যারেজের পথ দেখতে পেল ও। তারও দুশো গজ পরে ক্রসরোড মেন রোডের সাথে যুক্ত হয়েছে। আলফা-রোমিওর কথা মনে পড়ে যেতে মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল সোহানার। আলফা-রোমিও বেন্টলীকে রাস্তার মাঝখানে হারিয়ে ফেলেছে, ধারণা করল ও। কিন্তু অনুমানের উপর নির্ভর করে এদিকে আবার এসে পড়তে পারে। এলেই

পরিষ্কার দেখতে পাবে বেন্টলীকে।

সোহানা হোটেলের সুইং-ডোরের দিকে তাকাল। এখনও ফিরে আসছে না রানা। হোটেলের ব্যবস্থাপনা কেমন পরীক্ষা করে দেখছে হয়তো। গাড়িতে স্টার্ট দিল সোহানা। গ্যারেজের দিকে না গিয়ে গাড়িটা সামনে এগিয়ে নিয়ে গেল ও। গলির ভিতর দাঁড় করিয়ে সিক্রেট মাস্টার সুইচ টিপে নেমে পড়ল সোহানা। ধীর পদক্ষেপে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল ও। আলফা-রোমিও যদি এসে পড়ে তাহলে হোটেলের সামনের বাগানে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারবে ও। বেন্টলীকে হঠাৎ দেখতে পাবে না তারা।

মাঝেমধ্যেই মেন রোডের দিকে তাকাচ্ছিল সোহানা। আলফা-রোমিও আসছে না। ইতস্তত দৃষ্টিতে চারদিকের দৃশ্যের উপর নজর বোলাতে লাগল ও।

সন্ধ্যা জমাট বাঁধছে। তারা ফুটেছে আরও ঘন হয়ে। পাঁচ কি সাত মিনিট হয়ে গেছে হোটেলে ঢুকেছে রানা। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল সোহানা। কোথাও কোন গাড়ির নামগন্ধ নেই। অথচ মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে আশেপাশে। তীব্র গতিতে কোন গাড়ি ছুটে আসছে।

চোখের পলকে হোটেলের গ্যারেজের দিক থেকে একটা গাড়ির বেরিয়ে এল। মোড় নিয়েই মেন রোডের দিকে ছুটল গাড়িটা। চিনতে পেরে বিমূঢ় হয়ে পড়ল সোহানা। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা করেছিল ও। আলফা-রোমিও ওদের আগেই হোটেলের গ্যারেজে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ অমন তুমুল গতিতে ছুটে বেরিয়ে গেল কেন গাড়িটা? প্যাসেঞ্জারদেরকে দেখার সুযোগও পায়নি সে।

বিরক্তিবোধ ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সোহানার ভেতর। এত দেরি হবার কারণ কি রানার? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আরও দু'তিন মিনিট কাটল। মনে মনে রানার উপর খেপে উঠল ও। রাগের মাথায় সশব্দ পায়ে হোটেলের প্রবেশ পথের দিকে এগোল ও।

দশমিনিট পর ক্লান্ত ও পরাজিত হয়ে একই পথে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল সোহানা। ম্যানেজার, ডেস্ক ক্লার্ক, হল পোর্টার—তিনজনই একবাক্যে বলেছে কোন বিদেশী আজ হোটেলে ঢোকেনি। সোহানার বুঝতে অসুবিধে হয়নি কিছুই। তিনজনের হাবভাবেই ধরা পড়ে গেছে সব। তাছাড়া গ্যারেজে নামার সিঁড়ির শেষ ধাপে পেয়েছে ও নাইলনের ক্যামেলিয়া ফুল। রানার বাটন হোলে পরিয়ে দিয়েছিল গিয়াকোমা। আলফা-রোমিওর লোকগুলো রানাকে কাবু করে নিয়ে চলে গেছে সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই সোহানার।

বিভ্রান্ত হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে সরাসরি গাড়িতে এসে উঠল ও। দ্রুত চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে। কি করতে পারে এখন সে? এখানে বিশ্রাম না নিয়ে মিলানে যেতে পারে গাড়ি চালিয়ে, সেখান থেকে এমব্যাসির মাধ্যমে খবর পাঠাতে পারে মেজর জেনারেলের কাছে। কিন্তু উত্তর পাবার আগেই নির্দিষ্ট আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে যাবে। ইটালিয়ান পুলিস আটকে

দেবে কয়েদখানায়। না, রিস্ক নেবে না ও। ভেবে চিন্তে একটা পথ বের করল সোহানা। মিলানে পৌঁছে প্লেন ধরবে ও। সোজা লন্ডনে চলে যাবে। তারপর যোগাযোগ করবে ঢাকার সাথে।

মাস্টার কী রিলিজ করে গাড়ি স্টার্ট দিল সোহানা

'সীট স্টিল। ডোন্ট মুভ।' ঘাড়ের পিছনে ঠাণ্ডা ধাতুর ছোঁয়া পেয়ে স্থির হয়ে গেল সোহানার হাত দুটো। লোকটা এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে হর্নের বোতামে চাপ দিল একবার।

আশপাশ থেকে বুট জুতোর শব্দ শোনা গেল হর্ন থামতেই। আর একজন ইটালিয়ান ফ্রন্ট ডোরের সামনে এসে দাঁড়াল। পিছন থেকে প্রথম লোকটা বলল, 'উঠে পড়ো, উগো। দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই।'

উগো দরজা খুলে সোহানার পাশে বসল।

'এসব কি?' সোহানা পাশের লোকটার দিকে হিংস্র চোখে তাকাল, লোকটাকে চিনতে পেরেছে ও। আলফা-রোমিওর আরোহীদের একজন। সোহানা পিছনের লোকটাকে দেখতে না পেলেও বুঝল সে-ও আলফা-রোমিওর আরোহী।

'কি চাও তোমরা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সোহানা, 'মগের মুল্লুক? জানো এর ফলে তোমাদের কি দশা হবে?'

ঘাড়ের পিছন থেকে ধাতব বস্তুটা সরে গেল। দুটো হাত হঠাৎ অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরল ওর গলা। দু'হাত দিয়ে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করল সোহানা। পাশের লোকটা হাতের রুমাল দিয়ে চেপে ধরল ওর নাক মুখ। হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ির কোনও সুযোগ না পেয়েই জ্ঞান হারাল সোহানা।

সময় নষ্ট করল না ওরা। কর্ড দিয়ে ওর দুটো হাত বাঁধা হলো। সোহানার অচেতন দেহটা ব্যাক সীটে রেখে এল উগো।

পাঁচ

জ্ঞান ফিরে পেয়েই আধ ডজন প্রচণ্ড ঘুসির সিদ্ধান্ত নিল রানা। কবীর চৌধুরীর মুখের চারদিকে মারবে ও।

নিঃসাড় পড়ে রইল। জায়গাটা মোটেই আরামদায়ক না। বুঝতে অসুবিধে হলো না, গাড়ির বুটের ভিতর গুঁজে রাখা হয়েছে ওকে। প্রবল গতিতে ছুটছে গাড়ি।

বুটের ফাটল দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে বাষ্প ঢুকছে। বিপদটা টের পেল রানা। এখন ওর একমাত্র কাজ জ্ঞান ফিরে এসেছে তা ওদেরকে বুঝতে না দেয়া। মনে পড়ল, হোটেলের ম্যানেজার ঠিক আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে সোহানার অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলতে শুরু করে। আলফা-রোমিওর শয়তানগুলো ব্যাপারটার জন্যে দায়ী এবং গোটা ব্যাপারের জন্যে দায়ী কবীর

চৌধুরী, তা বুঝে নিয়েছে রানা জ্ঞান ফিরে পেতেই। ওকে কুপোকাত করার পরমুহূর্তেই ওরা যদি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে থাকে তাহলে পঞ্চাশ মিনিট ধরে ছুটছে আলফা-রোমিও। স্পীড অনুমান করে রানা হিসেব বের করল। গাড়ি চল্লিশ মাইলের বেশি পথ পেরিয়ে এসেছে ইতোমধ্যে। ঘড়ির কাঁটা বলছে ন'টা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি।

আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। রেল-ক্রসিং সামনে। ট্রেনের শব্দ। হিসেব যদি ভুল না হয় তাহলে আলফা-রোমিও দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। ডোমেগ-লায়রা আর ভেরোনার মাঝখানে কোথাও হবে রেল-ক্রসিংটা।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতেই প্যাসেঞ্জার সীট থেকে নিচে নামল কেউ। নিঃসাড় পড়ে রইল রানা। বুট খোলার শব্দ ঢুকল কানে। সম্পূর্ণ শক্তি ফিরে পাওয়া দরকার আক্রমণ করে মুক্তি লাভের জন্যে। সময় হয়নি এখনও। দম বন্ধ করে পড়ে রইল ও। ওকে অচেতন দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বুট নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল লোকটা। তারপর কথা শোনা গেল তার, 'ঘুসিটা জোরাল হয়ে গেছে, গেলিনা। ব্যাটা বাঁচবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে আমার।' গাড়ি চলতে শুরু করল আবার।

পনেরো মিনিট পর একটি শহরে ঢুকল আলফা-রোমিও। রানার হিসেবে এটা ভেরোনা। ওর মনে পড়ল ভেনিস থেকে রওনা হবার সময় স্বেচ্ছায় ভায়া ভেরোনা রুটটা বেছে নিয়েছিল ও। টেরেন্টোয় যদি সোজাসুজি পৌঁছুতে চাইত তাহলে বাস্সানো হয়ে সহজ পথটা বেছে নিত, পঁচিশ মাইল বাঁচত কম করেও তাতে। তার মানে, শহরটা যদি ভেরোনা হয় নিশ্চয় ওরা ভেনিসের দিকে যাচ্ছে না। দক্ষিণ দিকে, অ্যাপুলিয়াতে সিনোর মানাটোফের আস্তানা। কবীর চৌধুরীর আস্তানা হয়তো ওটাই। রানার মনে পড়ল আলফা-রোমিও বারীতে রেজিস্টারড্। আর কোন সন্দেহ নেই। দক্ষিণ দিকেই যাচ্ছে গাড়ি। ইটালির ম্যাপটা মানসপটে স্থাপন করল ও। পরবর্তী শহর তাহলে মোডেনা। পো ভ্যালির শেষ মাথায়, সত্তর মাইল সামনে। গাড়ির স্পীড অনুমান করল। একঘন্টারও বেশি লাগবে এই স্পীডে মোডেনা পৌঁছুতে। না, অতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না।

রাস্তার ডান দিকে মাথা রেখে বুটের ভিতর পড়ে রয়েছে ও। কানের কয়েক ইঞ্চি দূরে ছন্দময় টিক টিক শব্দ হচ্ছে। গাড়ির গতির সাথে কমে বাড়ে শব্দটা। লোয়ার গিয়ারে যাবার সময় দ্রুত হয় টিক টিক। ইলেকট্রিক্যালি ড্রিভেল পেট্রল পাম্প। বেন্টলীর পেট্রল পাম্পের ডুপ্লিকেট আছে। কিন্তু খুব কম গাড়িরই থাকে। পেট্রল পাম্পটা হুইল আর্কের ঠিক উপরের একটি তাকের আড়ালে। টার্মিনালে ইলেকট্রিক লীড জড়ানো, অনুভব করতে পারল রানা। টার্মিনালটা ঢিলে, প্যাঁচ খুলতে অসুবিধা হবে না সময় মত। তার বিচ্ছিন্ন করে ফেলাটাও একটা টানের অপেক্ষা। বুটের ঢাকনিটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। এক ধাক্কায় ছেঁড়া অসম্ভব মনে হলো না। দ্রুত কাজ শুরু করল ওর মাথা।

বাধা পড়ল কাজে। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। পাঁচ সেকেন্ড পর

বুটের ঢাকনি উঠল উপর পানে। তিন সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা। কোন আভাস না দিয়েই প্রচণ্ড আঘাতটা এসে লাগল রানার তলপেটে। সবটুকু ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে গলা থেকে আর্তনাদ বেরুতে দিল না ও। আবার একটা প্রচণ্ড আঘাত আসবে, আশা করছিল ও।

চুপচাপ সহ্য করল রানা। গেলিনা একটা সরু লাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছে ওকে। তিনবারের বারও রানাকে নড়তে-চড়তে না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেল সে। গাড়িতে চড়ে কথা বলছে, 'বস্ জীবিত পেতে চান ওকে। যদি সম্ভব হয়, বলেছিলেন। মরে গেলেও আসে যায় না কিছু...'

'মরুক, বাঁচুক আমাদের তাতে কি। আমি ভাবছি দেরির কথা,' উত্তর দিচ্ছে স্টেফ্যানো। ওদের কথাবার্তা শুনে রানা বুঝতে পারল রাস্তাটা আন্ডার রিপেয়ার। বিকল্প সরু একটা রাস্তা সামনে। ওয়ান ওয়ে। অটোমেটিক সিগন্যাল কন্ট্রোল করে ট্রাফিক। সিগন্যাল আলফা-রোমিওর বিপক্ষে।

বিকল্প সরু রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো। ঝাঁকানি খেয়ে শরীরটা এপাশ ওপাশ করছে। কিন্তু এখনই কাজে হাত দিতে হবে বুঝতে পারল রানা। মেন রোডে পৌঁছুতে দেরি আছে মিনিট দশেক। হিসেব ভুল না হলে বিরাট একটা ব্রিজ পড়বে মেন রোড ধরে খানিকটা গেলেই।

হাতড়ে হাতড়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির খোপ থেকে একটা স্টীলের বার তুলে নিল ও। আঠারো ইঞ্চি লম্বা, দেড় ইঞ্চি চওড়া। চলনসই।

মেন রোডে উঠে এল গাড়ি। আস্তে আস্তে পেট্রল পাম্পের টার্মিন্যালের প্যাঁচ খুলল রানা। টান মেরে না ছিঁড়ে স্ক্রুর প্যাঁচ ঢিলে করে বিচ্ছিন্ন করল তার। থেমে গেল টিক টিক। তিরিশ সেকেন্ড অবধি কিছুই ঘটল না। পরমুহূর্তে মিস ফায়ার করল ইঞ্জিন। পরপর বিস্ফোরণের ধাক্কা এসে লাগতে শুরু করল রানার ঠিক নিচে এগজস্ট থেকে। গাড়ির গতি কমতে কমতে দাঁড়িয়ে পড়ল একেবারে। কথা বলছে স্টেফানো আর গেলিনা। হ্যান্ড ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করবার সময় শব্দ হলো, সেই সুযোগে বুটের ঢাকনিতে বাঁধা দড়ি ছিঁড়ে ফেলল রানা।

ভাগ্য পরীক্ষার সময় হাজির হয়েছে। শতকরা নব্বই জন এই পরিস্থিতিতে গাড়ির সামনে বনেট খুলে সমস্যাটা বুঝতে চায়। কিন্তু পেট্রল পাম্পে গোলমাল হয়েছে অনুমান করে থাকলে ওরা বুটের দিকেই এগোবে।

দু'জনই দরজা খুলে রাস্তায় নামল। বুট খোলা হলে কোন উপায় থাকবে না রানার। হাত-পা জড়ো করে কোনরকমে পড়ে আছে ও। এই অবস্থায় আক্রমণ করে সুবিধে করা অসম্ভব। কিন্তু বনেট খোলার শব্দ কানে ঢুকতেই সবেগে বুটের ঢাকনিটা একহাতে উপর দিকে ঠেলে পা দুটো নামিলে দিল রানা নিচের দিকে।

রাস্তায় নেমে ভারসাম্য ফিরে পেতেই দেখল বনেট বন্ধ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে দু'জন। কয়েক পা পিছিয়ে এল রানা। হাতে ধরা স্টীলের বারটা লুকোবার চেষ্টা করল না।

আগে পা বাড়াল গেলিনা। ডান হাতটা পকেটের মুখে চলে গেছে।

স্টেফানো আক্রমণের ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগোচ্ছে।

খোলাখুলি যুদ্ধ। স্টেফানোর ডান হাত পকেটে ঢুকছে। হেঁটে আসছে সোজা রানার দিকে।

স্টীলের বারের একটা প্রান্ত শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে রানা। ধীরেসুস্থে দম বন্ধ করল। পর পর দু'বার তাকাল গেলিনার মুখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বুকের ঠিক মাঝখানে। তারপরই বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। ছুরি থ্রো করার কায়দায় প্রচণ্ড শক্তিতে স্টীলের বারটা গেলিনার বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল ও।

ছোরার মত ছুঁচাল বলে গেলিনার বুকে নিখুঁত বিঁধে গিয়ে আটকে গেল বারটা। দু'সেকেন্ড রইল সেটা গেলিনার বুকে। তার আগেই বীভৎস একটা শব্দ কানে ঢুকেছে বুকের হাড় ভেঙে যাবার। গেলিনার হাত দুটো শূন্যের দিকে উঠে গেল চকিতে। তারপর কাটা কলা গাছের মত সশব্দে পড়ে গেল দেহটা রাস্তার উপর। ঠিক তখনই লাফ দিল রানা।

স্টীলের বারটাকে ধরবার জন্যে স্টেফানো ঝুঁকে পড়েছে। এক লাফে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল রানা। বারটা ছাড়ল না স্টেফানো। চিৎ হয়ে পড়ে গিয়ে দু'হাতে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করল ও। হাঁটু ভাঁজ করে উঠে দাঁড়াবার মহরত দেখাচ্ছে যেন। স্টেফানোর থুতনিতে সবুট লাথি মারল রানা। হাতের ভাঁজ ভেঙে যেতে মাথাটা রাস্তার উপর ঠক্ করে ঠুকে গেল। বুকের উপর পা তুলল রানা। সবেগে নেমে এল বুট। স্টেফানোর গলায় আটকে থাকা বাতাস বেরিয়ে এল ফোঁস করে। তারপরই নিঃসাড় হয়ে গেল দেহটা।

দু'জনার পকেট হাতড়ে একটা নোট বুক পেল রানা। সেটা নিজের পকেটে ভরে দু'জনার কোমর থেকে বেল্ট খুলে নিল। বাঁধল একসাথে। তারপর রাস্তার পাশের অল্প নিচু খাদটা পরীক্ষা করে এসে টেনে নিয়ে গেল জ্ঞানহীন দেহ দুটো খাদের কিনারায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে ঠেলে দিল ওদেরকে। গড়াতে গড়াতে নেমে গেল ওরা খাদের নিচে। জ্ঞান ফিরে এলে বাঁচবে। আর ইতোমধ্যেই মরে গিয়ে থাকলে তো প্রশ্নই ওঠে না।

বুট খুলে বিচ্ছিন্ন তার জোড়া দিয়ে টার্মিনালের প্যাঁচ কষতে একমিনিটও লাগল না রানার। গাড়ির ভিতর ঢুকে স্টার্টারে চাপ দিতেই স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়ল ও।

মাইলখানেক যাবার পর একটা রেস্তোরাঁ পড়ল রাস্তার পাশে। ছোট শহর। গতি শ্লথ না করেই নামটা পড়ে নিল রানা। রেভেরি। আরও ক'মাইল এগোবার পর গাড়িটা সার্চ করার জন্যে ব্রেক করল ও। একটা পরিকল্পনা করা দরকার এখন।

টেরেন্টোয় আক্রান্ত হবার পর এই প্রথম ভাবল রানা হোটেল থেকে ওকে বেরিয়ে আসতে না দেখে সোহানা কি কি করেছে ইতোমধ্যে। কিংবা সোহানাকে নিয়ে কে কি করেছে। আলফা-রোমিওর বাকি দু'জন আরোহীর কথা ভোলেনি রানা।

একটা টর্চ ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না গাড়ির ভিতর। ভেবেচিন্তে

টেরেন্টোয় আবার ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না ও। সবচেয়ে আগে সোহানার খবর চাই।

টেরেন্টো নব্বই মাইল দূরে। মরিয়া হয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করল রানা ফিরতি পথে। গেলিনা আর স্টেফানোকে যেখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল সে জায়গাটা অতিক্রম করার সময় প্রতিজ্ঞার কথাটা আর একবার মনে পড়ে গেল ওর। আধ ডজন ঘুসি, চোখেমুখে।

এক মাইল যাবার পর চোখে পড়ল টেমপোরারি ব্রিজের ওয়ার্নিং নোটিশ। ব্রিজ পেরিয়েই সিঙ্গল লাইন ট্র্যাক সেকশন। দুটো গাড়ি সামনে, আলফা-রোমিওকে দাঁড় করাতে বাধ্য হলো রানা। খুব সরু রাস্তা। বাঁ দিকে দক্ষিণগামী গাড়িগুলোর জন্যে সামান্য একটু জায়গা। ডান দিকে খালি জায়গা নেই বললেই চলে। বনভূমির সীমানা কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। পিছনে কয়েকটা গাড়ি লাইন দিল। সামনে বা পিছনে কোন দিকে যাবার উপায় নেই। দু'তিন মিনিট কেটে গেল। দক্ষিণমুখী গাড়িগুলো ধীর গতিতে চলে যাচ্ছে পাশ কাটিয়ে।

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে দক্ষিণ মুখো আর ক'টা গাড়ি যাবে জানার জন্যে জানালা দিয়ে মাথা বের করে দেখার চেষ্টা করল রানা। তারপরই চোখে পড়ল ওর বেন্টলীটা।

সাবলীল ভাবে পাশ কাটিয়ে চলে গেল গাড়িটা। দাঁড় করানো গাড়িগুলোর হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল সামনের সীটে দু'জন মাত্র আরোহী। পিছনের সীটে একটা লম্বা বস্তার মত মোটা কম্বল চাপা দেয়া। আরোহী দু'জনই তাকিয়েছিল রাস্তার বিপরীত দিকে।

ঝট করে গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। পিছন পিছন দৌড়ে গাড়িটার গতি রোধ করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না ও। কিন্তু দৌড়ুল না। লাভ হবে না কোনও।

বোকার মত তাকিয়ে রইল রানা। প্রতি সেকেন্ডে দূরে সরে যাচ্ছে বেন্টলীর পিছনের লাল দুটো আলো। সোহানা গাড়িতেই আছে। সোহানা না সোহানার লাশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা? গাড়ির ভিতর উঠে এল রানা। পাঁচটা অসহ্য মিনিট অতিবাহিত হলো একে একে। তারপর ধীরে ধীরে আলফা-রোমিওর সামনে গাড়িগুলো এগোতে শুরু করল ধীরে গতিতে। পিছন থেকে গোটা চারেক গাড়ির হর্ন ধমকে উঠল একযোগে।

মোড় নেবার উপায় নেই। বাধ্য হয়ে সারবন্দী ভাবে প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর দ্রুত বেগে মাইলখানেক রাস্তা অতিক্রম করার পর মেন রোডের উপর এল আলফা-রোমিও। রাস্তার কিনারায় একটা পাইন গাছের পাশে ওটাকে দাঁড় করাল রানা। সাঁ সাঁ করে গোটা সাতেক গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল। রাস্তা পরিষ্কার হতে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা।

টেমপোরারি ব্রিজের কাছাকাছি আলফা-রোমিও পৌঁছুতেই নীল আলো লালে বদলে যেতে দেখল ও। আবার মিনিট পাঁচেক ধরে সামনের সারবন্দী গাড়িগুলোর সাথে আস্তে আস্তে এগোবার পালা আরম্ভ হলো। অবশেষে

হাইওয়েতে উঠে এল আলফা-রোমিও। গাড়িকে পক্ষীরাজের মত উড়িয়ে নিয়ে চলল। দশ সেকেন্ডের মধ্যে আলফা-রোমিও ওভারটেক করল তিনটে গাড়ি। পনেরো মিনিটের কিছু বেশি বেন্টলী পাশ কাটিয়ে গেছে ওকে। পনেরো মাইলের তফাৎ এখন বড়জোর।

স্পীড বাড়িয়ে চলল রানা পরবর্তী পঁচাত্তর মিনিট একনাগাড়ে। পঁয়ত্রিশ মাইলের পথ মোডেনায় পৌছুতে পনেরো মিনিট লাগল আলফা-রোমিওর। শহরের মধ্যে গতি কমাতে বাধ্য হলো ও। পুলিসের সাথে গোলমাল বাধাবার ইচ্ছা নেই কোন। কিন্তু মেন রোডে পৌছে বোলোনিয়ার দিকে ছুটল গাড়ি একশো আশি কিলোমিটার বেগে। স্পীড মিটারের কাঁটার দিকে চোখ পড়তে মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার। মিনিটে প্রায় দু'মাইল গতিতে ছুটছে আলফা-রোমিও, কিন্তু ইঞ্জিন শান্ত ও সাবলীল। লাইট পোস্টগুলো তীব্রবেগে সামনে থেকে উল্টো দিকে দৌড়ুচ্ছে একটার পর একটা। গাড়ির কাউন্টারে লাল ওয়ার্নিং আলো জ্বলে উঠতে দেখল ও। তিন সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে রইল ও। রাস্তার সামনে চোখ মেলল হঠাৎ। তারপরই ব্রেক কষল রানা। চোখের সামনে দুলে উঠল পৃথিবীটা পলকের মধ্যে।

কয়েক সেকেন্ড অসহায় বোধ করল রানা। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছে ও। খরগোশটা বোকার মত তাকিয়ে আছে সরাসরি আলফা-রোমিওর দুই লাইটের দিকে। রাস্তার মাঝখান থেকে একচুল নড়ার লক্ষণ নেই অবোধ জানোয়ারটার।

বিদ্যুৎবেগে মুখ ঘুরে গেল আলফা-রোমিওর। পিছনটা রাস্তা ছেড়ে উঠে পড়ল আধহাত শূন্যে। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ি সোজা করার চেষ্টা করল রানা। তীক্ষ্ণ, কর্কশ শব্দ উঠল কংক্রিটের সাথে চাকার ঘর্ষণে। তড়াক করে লাফ মারল খরগোশটা। ওর আধহাত দূর দিয়ে তীরের মত বেরিয়ে গেল গাড়ি।

সামান্য একটা জানোয়ারের জন্যে আর কোনদিন প্রাণের ঝুঁকি নেবে না, ভাবল রানা।

ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা দেখে হিসেব করল ও।

বোলোনিয়ায় পৌছে গেছে আলফা-রোমিও। মোডেনা থেকে পঁচিশ মাইল। পনেরো মিনিট লেগেছে। শহরের ভিতরে আবার গতি কমাল রানা।

শহর থেকে বেরিয়ে ডজন দুয়েক গাড়ি ওভারটেক করে পনেরো মিনিটে ইমোন-এর শহরতলিতে পৌছে সামনের লাল আলোর টুকরোটাকে পেন্ডুলামের মত ঝুলতে দেখতে পেল ও। হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে খাকী ইউনিফর্ম। দ্রুত চিন্তা করে নিল রানা। গতি কমিয়ে ফেলেছে ও আলফা-রোমিওর। করপোরেলের কাছ থেকে তিনগজ পিছনে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। রেগুলার রোড চেক হচ্ছে বুঝতে পেরেছে ও। করপোরেল পা বাড়াবার আগেই হাতছানি দিল ও।

নোটবুক আর বল-পেন্সিল হাতে করপোরেল জানালার কাছে এসে দাঁড়াতে স্থানীয় ভাষায় প্রশ্ন করল রানা, 'এক্সকিউজ মি, অফিসার। কতক্ষণ ধরে এখানে আছেন আপনি?'

'দেড় ঘণ্টা, স্যার,' বিদেশী একজন লোককে ইটালিয়ান ভাষা বলতে শুনে গর্ব অনুভব করল করপোরেল, 'বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

হাসল রানা। একটু ইতস্তত ভাব দেখাল। তারপর বলল, 'আপনার লিস্টটা একটু দেখতে পারি কি?'

বিনীত ভাবে মাথা নাড়ল করপোরেল, 'অবশ্যই, স্যার।' ভাল করে লক্ষ করল সে রানাকে, 'কি জানতে চান, স্যার?'

'একটা বেন্টলী,' বলল রানা। 'কতক্ষণ আগে এখান দিয়ে গেছে জানতে চাই।'

প্রশ্নের সম্মুখীন হবার আগেই বানানো গল্পটা বলতে শুরু করল রানা। দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল ওরা—রানা, আর রানার বন্ধু। বেন্টলী আর আলফা-রোমিওতে ছিল ওরা। ওর বন্ধুরা গাড়ি বদলাবার প্রস্তাব দেয়। স্পীড পরীক্ষা করার ইচ্ছা রানারও কম ছিল না। রাজি হয়ে যায় সে। কিন্তু ওর বেন্টলী হারিয়ে দিয়েছে আলফা-রোমিওকে। বেন্টলীর চেয়ে কতটা পিছনে আছে আলফা-রোমিও সেটা জানতে পারলে উপকৃত হবে সে।

নীরবে শুনল করপোরেল কথাগুলো। তারপর প্রশ্ন করল, 'গাড়ি কোথায় বদল করেছেন আপনারা বললেন?'

'ভেরোনায়।'

'এবং দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন আপনারা,' করপোরেল একটু চিন্তা করল, 'বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা কি ঘটেছে! আপনি আসলে জানেন না, স্যার, রিমিনি এবং পেস্কারার মাঝখানের রাস্তাটা মেরামতের জন্যে বন্ধ। আপনার বন্ধুরা এদেশীয়, তারা নিশ্চয় জানে ব্যাপারটা। তারা ফ্লুরেন্সের ভেতর দিয়ে ফুটা পাস হয়ে তারপর হয় সীয়েনা এবং র‍্যাডিকোফানির উপর দিয়ে রোমের দিকে চলে গেছেন কিংবা পেরুজিয়া এবং আপুইলা হয়ে চলে গেছেন ইস্ট কোস্টের দিকে। আপনাকে জানানো উচিত ছিল ওদের।'

কোন আশা নেই। দক্ষিণে যাবার আরও অন্তত দুটো বিকল্প রাস্তা আছে। ভুল হয়ে গেছে।

কথা বলে চলেছে করপোরেল। ধন্যবাদ জানিয়ে রানা বলল, 'আমি বরং বোলোনিয়াতেই ফিরে যাই। কাল সকালে আবার ছুটব।' গাড়ি ঘুরিয়ে নিল ও।

বেন্টলীকে ধরা অসম্ভব। এখন কি করতে পারে ও?

আনমনা হয়ে মিনিট পাঁচেক গাড়ি চালাবার পরই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো রানা। বোলোনিয়া থেকে ত্রিভিসো একশো ত্রিশ মাইলের বেশি নয়। ইটালিয়ান এয়ারলাইনের একটা প্লেন সোয়া চারটের পর যে-কোন সময় ছাড়বে জানা আছে ওর। লন্ডনেই নাস্তা সারবে ও।

ফিলিং স্টেশনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ট্যাঙ্ক ভর্তি পেট্রল নিয়ে নিল রানা। তিনটের সময় মেস্ট্রি পৌঁছল আলফা-রোমিও।

এয়ারপোর্টে গাড়ি থেকে নেমে খোঁজ নিয়ে জানা গেল ঘণ্টা খানেক বাকি আছে প্লেন ছাড়তে। রেস্তোরাঁর টেলিফোন বুদে সরাসরি গিয়ে ঢুকল রানা। লন্ডনের এজেন্টকে নির্দেশ দিয়ে রাখতে চায় ও ঢাকার সাথে আগে থেকেই

যোগাযোগ করার জন্যে।

কল বুক করার পর বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ কফি নিয়ে বসল রানা। পাঁচ-সাতজন রাত-জাগা লোক কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে ধীরে ধীরে রেস্তোরাঁয়। রানার দিকে লক্ষ্য নেই কারও। কফি শেষ হবার সাত মিনিট পর উত্তর এল লন্ডন থেকে। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল রানা, 'হ্যালো। জিরো ওয়ান, ওয়ান জিরো?'

'জিরো ওয়ান, ওয়ান জিরো,' অপর প্রান্ত থেকে পরিষ্কার উত্তর এল, 'নাম্বার, প্লীজ?'

নিজের নাম্বার বলল রানা, 'কেমন আছ, আহাদ?'

'আরে!' অপর প্রান্তে আহাদ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, 'আপনি?'

কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে। পাঁচ সেকেন্ড কোন কথা বলল না রানা। দ্রুত চিন্তা করছে ও। তারপর গম্ভীর গলায় বলে উঠল আস্তে আস্তে, 'হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার, আহাদ?'

'না,...মানে—আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন...' আহাদ কথা শেষ করল না।

রানা বলে উঠল, 'হ্যালো।'

উত্তর এল না কোন। অথচ যোগাযোগ কাটেনি ফোনের। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় দেখল না রানা।

একে একে তিন মিনিট কেটে গেল। অধৈর্য হয়ে উঠল রানা। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লন্ডন ব্রাঞ্চে কিছু একটা ঘটেছে। দ্রুত কল্পনা করার চেষ্টা করল ও।

তিন মিনিট পনেরো সেকেন্ড পর অপর প্রান্ত থেকে নতুন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুকের ভিতর।

'রানা বলছ?' সেই গম্ভীর গলা। অতি-পরিচিত। কিন্তু ভুল শুনছে নাকি ও?

'জ্বী, স্যার।' পাঁচ সেকেন্ড পর গলা দিয়ে শব্দ বের হলো রানার।

'ত্রিভিসো থেকে বলছ?'

'জ্বী, স্যার।'

'চলে এসো, রানা। চারটে বিশ মিনিটে প্লেন আছে একটা। মিস কোরো না।'

কিছুই বুঝতে পারল না রানা। ওর মনের কথা জানে নাকি বুড়ো? এদিকে কৌতূহলও মিটছে না—লন্ডনে কেন বস্?

'আপনি কখন এলেন লন্ডনে, স্যার?' প্রশ্নটা না করে পারল না ও, 'আমি কি লন্ডনে যাব?'

গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। রানা মানসপটে দেখতে পেল কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে বুড়োর, 'এলে সব জানতে পারবে। হ্যাঁ, লন্ডনে এসো।'

বুড়োকে খেপিয়ে দেবার লোভটা সামলাতে পারল না রানা, 'কিন্তু,

স্যার, আমার এখানে কিছু জরুরী কাজ রয়েছে যে।'

'সব ফেলে চলে এসো,' ভারী গলায় বললেন রাহাত খান। 'দিস ইজ মাই অর্ডার, রানা।'

ওরেব্বাপরে! রোমাঞ্চিত বোধ করল রানা। বড় ধরনের কোথাও কিছু একটা ঘটেছে তাহলে।

'ঠিক আছে, স্যার,' বলল রানা। 'আমি আসছি।' ফোন ছেড়ে দিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান—ওর আগেই।

ছয়

সাতটা তিরিশ মিনিটে লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল রানা। আহাদ অপেক্ষা করছিল গাড়ি নিয়ে। রানাকে সোজা পিকাডেলি স্কয়্যারের এমব্যাসিতে নিয়ে এল ও। পথে কথাবার্তা বিশেষ কিছু হলো না। রানা শুধু জানতে চাইল, 'বুড়ো লন্ডনে পৌঁছেছে কবে?'

'বলতে পারি না। গতকাল হাইকমিশনার কল করেছিলেন আমাকে' বলল আহাদ। 'গিয়ে দেখি বস্ স্বয়ং হাজির। আমাকে ডেকেছিলেন তৈরি থাকার জন্যে। যে-কোন মুহূর্তে ইটালিতে যেতে হতে পারে। আটজনের একটা দলের সাথে। ইউরোপের সব এজেন্টকে লন্ডনে হাজির হবার নির্দেশ পাঠিয়েছেন বস্। এখন আর আমাদের দরকার হবে না।'

'কেন?'

'আপনি না এলে আমরা যেতাম। এখন বোধহয় দরকার পড়বে না,' নিরুৎসুক কণ্ঠে বলল আহাদ।

কথা না বলে রাস্তার দিকে তাকাল রানা।

দূতাবাসের তেতলায় থার্ড সেক্রেটারির সাথে দেখা হলো রানার। ভদ্রলোক ওর পরিচিত নয়। কিন্তু পরিচয় দিতেই হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্যে, নিজের পরিচয় পেশ করে বললেন, 'আপনার জন্যে মেজর জেনারেল অপেক্ষা করছেন, মি. মাসুদ। আসুন পৌঁছে দিই আপনাকে।'

আহাদ নিচতলা থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেছে। রানা থার্ড সেক্রেটারির সাথে পাশাপাশি হেঁটে করিডরের মাঝখানে একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় নক করলেন থার্ড সেক্রেটারি।

ভিতর থেকে ভারী গলা ভেসে এল, 'কাম ইন।'

দরজা ঠেলে রুমের ভিতর পা দিল রানা। বুকের ভিতর পুরানো ধক ধক শব্দটা শুরু হয়েছে এখানেও। বুড়োর মুখোমুখি হবার আগে এরকম হয় ওর। বিশ্বাস নেই, বুড়ো হয়তো প্রথমেই কড়া ভাবে ধমকে উঠবে খামোকা।

মেজর জেনারেল রাহাত খান ছাড়া দামী কার্পেট পাতা রুমের ভিতর আর কেউ নেই। ওয়াল-স্ক্রিনগুলো দুলছে জানালা গলে আসা লন্ডনের

গ্রীষ্মকালীন বাতাসে। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর ইউরোপের একটা ম্যাপ পাতা। টেবিলের উপর প্রসারিত শীর্ণ একটি হাত একটা জ্বলন্ত পাইপ ধরে আছে। পাইপটা থেকে সরু নীলচে ধোঁয়া উঠছে এঁকে বেঁকে। আস্তে আস্তে পা ফেলে টেবিলের দিকে এগোতে এগোতে সব দেখে নিল রানা। মাথা নিচু করে ম্যাপ দেখছে বুড়ো।

'বসো, রানা,' মাথা না তুলেই বললেন রাহাত খান। নিঃশব্দে বসে পড়ল রানা।

'তোমার ডান পাশের ফাইলটা নেড়ে চেড়ে দেখো।' গম্ভীর গলায় নির্দেশ এল, 'সব জানতে পারবে।'

ফাইলটা পড়ে ফেলতে পাঁচ মিনিটও লাগল না রানা। বিশেষ কিছু নেই ওতে। ইটালিতে বাশারকে কেন পাঠানো হয়েছিল, তারপর সোহানাকে পাঠানো হয়েছে ইত্যাদি খবরাখবর ছাড়া বিশেষ কিছুই জানতে পারল না ও। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট। গোটা রহস্য কি জানতে বাকি রইল না ওর। অদ্ভুত দ্রুতগতিসম্পন্ন এয়ারক্র্যাফট বা সসারকে নিয়ে সমস্যা। দ্রুত চিন্তাস্রোত বয়ে গেল রানার মাথায়—কবীর চৌধুরীর সাথে এই রহস্যের যোগাযোগ···সম্ভব! মানাটোফ এয়ারক্র্যাফটের খুচরো অংশ তৈরি করে গিয়াকোমা বলেছিল।

'বাশারকে মেরে ফেলেছে,' রানার দিকে চোখ তুলে তাকালেন রাহাত খান, 'আহত হয়েছিল ও। শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছিল—শেষ মেসেজ। মেসেজটা পাঠাবার সময় হার্ট-ফেল করে। পুরো মেসেজ তাই পাইনি আমরা।' পাইপ মুখে তুলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে পাইপের দিকে খানিকক্ষণ চোখ রাখলেন তিনি, 'সোহানারও কোন খবর নেই।' পাইপটা নিরীক্ষণ করা থেকে নিবৃত্ত করে মুখের দিকে এখন সেটাকে টেনে আনছেন তিনি।

'সোহানাকে কবীর চৌধুরী ধরে নিয়ে গেছে, স্যার,' নেহাত গোবেচারার মত বলল রানা।

পাইপ ধরা হাতটা নেমে এল টেবিলের উপর। ভুরু জোড়া অতিমাত্রায় কুঁচকে ওঠায় কপালের ঠিক মাঝখানে গভীর গর্তের সৃষ্টি হলো একটা। একজোড়া চোখ তল্লাশি চালাচ্ছে রানার সারা মুখে।

মনে মনে হাসল রানা। কৌতূহলে মরে যাচ্ছে বুড়ো। কিন্তু নিরুৎসুক গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে সরাসরি প্রশ্ন করবে না তবু।

'রিপোর্ট করোনি কেন?' জবাবদিহি চাওয়ার ভঙ্গি রাহাত খানের গলায়।

'রিপোর্ট খানিক আগে লেখা শেষ করেছি, স্যার।' পকেট থেকে লম্বা একটা খাম বের করল রানা, প্লেনে বসে লিখে ফেলেছে আগেই ও। 'সব জানতে পারবেন এটা পড়ে।' খামটা টেবিলের মাঝখানে রাখল ও।

খামটার প্রতি কোন আকর্ষণ দেখা গেল না রাহাত খানের। রানার দিকে তিন সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর কাটা কাটা শব্দে উচ্চারণ করলেন, 'বিকেল চারটায় দেখা করবে। যাও।'

এরকম আশা করেনি রানা। আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে

দরজার কাছে চলে এল ও। পিছন থেকে ডাক পড়বে আবার ভাবল ও। কিন্তু না। কোন শব্দ নেই পিছনে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে পাঁচ সেকেন্ড বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল ও। তারপর নিরুপায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মনে মনে বলল—বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

বিকেল চারটায় আবার সেই একই দৃশ্যের অবতারণা হলো।

মাঝখানের সময়টা হোটেলে স্নানাহার সেরে লম্বা ঘুম দিয়েছে রানা। রাহাত খানের মাথায় কি সব পরিকল্পনা কিলবিল করছে সে-সম্পর্কে মিছে ভাবনা চিন্তে করে মাথাটা ভারাক্রান্ত করার কোন ইচ্ছে ছিল না ওর। যথাসময়ে পৌঁছে গেল ও এমব্যাসির ওয়াল-স্ক্রিন ঝোলানো রুমে।

'বাশারকে যে কাজে পাঠানো হয়েছিল সে কাজ শেষ করেছিল সে,' পাইপে টোবাকো ভরতে ভরতে বললেন রাহাত খান। 'যাবার সময় ফাইলটা পাবে তুমি। ওর সংগ্রহ করা সমস্ত তথ্য পাবে ওতে। বি.ও.এ. সি-র একটা প্লেন আজ ছাড়বে রাত দশটায়। যাত্রী তুমি একা। সাসেরটায় ল্যান্ড করার কথা ওটার রি-ফিলিংয়ের জন্যে। কমপাস ট্রাবলের জন্যে খানিকটা ডান দিকে চলে যাবে প্লেন। গোপনে নামবে ফোগিয়াতে। ফোগিয়া এয়ারপোর্টের নাম শুনেছ?'

উত্তরে 'না' বললেই ধমকে উঠবে বুড়ো, জানে রানা। নামটা ও শুনেছে। 'জ্বী, স্যার। ন্যাটোর ইমার্জেন্সী ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড আছে ফোগিয়ায়।'

'লুসেরা রোডের পাশেই এয়ারপোর্ট। লুসেরা শহরের তিন মাইল বাইরে। ফোগিয়া এয়ারপোর্ট এখন ব্যবহার করা হয় না। লোকজন নেই। দিনের বেলায় গরু চরে। তোমরা যখন নামবে তখন জ্যোছনা থাকবে। তোমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাবে প্লেন সাসেরটায়। এরপর তোমাকে কেউ কোনও রকম সাহায্য করবে না। ওখানে তোমার কাজ কি হবে, রানা?'

হাতের তালু দুটো ঘামছে ওর। বুড়ো খোলাখুলি কিছুই বলেনি এখন অবধি। সমস্যাটার উপর আলোকপাত করার কোন ইচ্ছা আছে বলেও মনে হয় না। যা জানার জানতে হবে বাশারের পাঠানো তথ্যভারাক্রান্ত ফাইল পড়ে।

ঢোক গিলে ধীরে ধীরে বলল রানা, 'বাশারের তথ্যগুলো পরীক্ষা করে দেখা দরকার, স্যার। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।'

'সবচেয়ে আগে সোহানাকে উদ্ধার করবে।' রাহাত খানের গলায় আদেশ। 'একজনকে ইতিমধ্যেই হারিয়েছি আমি। আর একজনকে বিপদের মুখে ফেলে রাখতে পারি না। তোমার প্রথম কাজ, যে-ভাবেই হোক, কবীর চৌধুরীর হাত থেকে সোহানাকে মুক্ত করা।'

রানা বলল, 'কবীর চৌধুরী এয়ারক্র্যাফট-রহস্যের সাথে জড়িত। কবীর...'

ওর কথায় কান না দিয়ে মেজর জেনারেল রাহাত খান বললেন, 'এবার আর কাঁচা কাজ করে এসো না, রানা। আবার যেন বেঁচে না যায় শয়তানটা।

এটা আমার দু'নম্বর অর্ডার। আর কিছু জানার আছে?'

তোমার মাথার ভিতরের সেলগুলো কি দিয়ে তৈরি জানার বড় ইচ্ছা আমার, মনে মনে বলল রানা। মুখে বলল, 'না, স্যার।'

'যাও তাহলে। আহাদ এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে তোমাকে। পাসপোর্ট, ফাইল—সব পাবে ওর কাছ থেকে।' রাহাত খান চোখ নামালেন টেবিলের উপর পেতে রাখা ইউরোপের ম্যাপে।

নিঃশব্দ পায়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

চাঁদের আলোয় রানওয়ের দিকে তাকাল ও। ভাল দেখা গেল না। কিন্তু পাইলট জেনে শুনেই ল্যান্ডিঙের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আধ-মিনিটের মধ্যে রানওয়ে ছুঁলো চাকা। রানওয়ের পাশে গভীর ঝোপ-ঝাড়। ম্লান জ্যোৎস্না ছাড়া কোথাও কোন আলোর চিহ্ন নেই। আধ মাইল দৌড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্লেন।

মাঝরাত হতে আঠারো মিনিট বাকি। হাতঘড়ি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা সীট ছেড়ে। পাইলটের কেবিনে ঢোকার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন বলে উঠল, 'বেস্ট অভ লাক, মি. আন-নোন।'

দরজা খুলে লাফ দিয়ে টারমাকে নামল রানা। পনেরো সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে দক্ষিণ দিকের টারমাকের ধার ঘেঁষে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল ও। হাতে অ্যাটাচি কেস।

সাত মিনিট পর নির্জন এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে রাস্তায় পৌঁছুল রানা। প্রশস্ত রাস্তা। ঝকঝক তকতক করছে। শহরের দিকে চলে গেছে সোজা। আকাশে একটি পাখি বা রাস্তায় একটি কুকুর—কিছুই নেই। দ্রুত হেঁটে মিনিট পাঁচেক পর চৌমাথায় এসে দাঁড়াল ও। লাইট পোস্টগুলো শুরু হয়েছে এখান থেকে। সোজা রাস্তার দিকে না গিয়ে ডান দিকে মোড় নিল রানা।

পঁচিশ গজ এগোবার পর ছোট্ট সাইনবোর্ডটা দেখা গেল একটা লাইট-পোস্টের গায়ে ঝোলানো। সান নিকানডো রোড়।

দুশো গজ পেরোবার পর পাহাড়ের খাড়া গা দেখতে পেল রানা। হাঁটার গতি শ্লথ করল ও। আর খানিকটা হাঁটলে পাহাড়ে ওঠার রাস্তা পাওয়া যাবে। বাশার ওখান দিয়েই উপরে উঠে গিয়েছিল।

এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি শহরে গিয়ে হোটেলে ওঠার পরিকল্পনাটা শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দিয়েছে রানা। বাশার যা দেখেছিল তা একবার দেখা দরকার নিজের চোখে।

ওটা আসলে ঠিক পাহাড় নয়। বস্তুত মন্টি সোরানো একটা মৃত আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরিটার দুটো মুখ। একটা চুড়োর কাছে। দ্বিতীয়টা পশ্চিম দিকের ঢালু পাহাড়ের গায়ে, চুড়ো থেকে দুশো ফিট নিচে। নিচের আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা—মিশেছে চওড়া একটা রাস্তার কিনারায়। অ্যাপ্রিসিনা থেকে সান মার্কোয় যাবার একটাই মাত্র রাস্তা ওটা।

চাঁদের আলোয় আবছাভাবে কাঁটাতারের বেড়া চোখে পড়ল রানার। দাঁড়িয়ে পড়ে বেড়াটা পরীক্ষা করল ও। কংক্রিটের পিলার দশ-বারো হাত পর পর। ছয় ইঞ্চি পর পর কাঁটাতার জড়ানো পিলারের গায়ে। দেড় মানুষ উঁচু। সন্তর্পণে তার বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল রানা। পিলারের মাথায় উঠে লাফিয়ে অপর দিকে নামল।

মন্টি সোরানো মানাটোফের এস্টেট। সুরক্ষিত করার চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই তার।

কাঁটাতারের বাধা অতিক্রম করে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। আড়াই ঘণ্টা প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রম করার পর আগ্নেয়গিরির শীর্ষ মুখ পেরিয়ে এল রানা। দুটো বড় পাথরের মাঝখানে থামল ও। চুড়ো থেকে শ'খানেক ফিট নিচে জায়গাটা। জ্বালামুখ দুটোর মাঝামাঝি জায়গায় পাথর দুটো। এর বেশি এগোবার চেষ্টা করা বোকামি। বাশারের রিপোর্ট অনুযায়ী আর দশ কদম পর থেকে মাইন পোঁতা আছে নুড়ি পাথরের নিচে।

ছোট জ্বালামুখটার পশ্চিম দিকটা খোলামেলা। সমতল পাথরের প্রশস্ত জায়গা খানিকটা। তারপর খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা। একধারে সরু একটা পথ, হারিয়ে গেছে বাঁ দিকের সার বাঁধা ঘরগুলোর পাশ ঘেঁষে। উত্তর দিকের মেন গেটে গিয়ে মিশেছে পথটা। মেন গেটটা দেখতে পাবার কথা দিনের আলোয়। পাহাড়ের গা বেয়ে গাড়ি আসে ওই টানেলে। মোটা স্টীলের দরজা পেরিয়ে সরু পথটা দিয়ে জ্বালামুখের সামনের চত্বরে পৌঁছানো যায়। ওটাই ভিতরে ঢোকার রাস্তা। আরও আছে। জ্বালামুখটা চত্বরের বেশ খানিকটা উপরে। বাশার এয়ারক্র্যাফটটাকে উঠতে দেখেছিল জ্বালামুখের নিচে থেকে।

ঘরগুলোর পরিষ্কার কাঠামো দেখার জন্যে সকাল অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় দেখল না রানা। ঘড়ি দেখল ও। আধঘণ্টা পরই একটু একটু আলো পাওয়া যাবে।

পনেরো মিনিট পর অ্যাটাচি কেসটা খুলে ফেলল রানা বিনকিউলারটা বের করার জন্যে। প্রথম গুলির শব্দটা হলো তখনই।

দুটো পাথরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল ও। মাথার কাছ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বুলেট। ঝপ্ করে বসে পড়ল রানা। পরপর দুটো বুলেট এসে লাগল পাথরের গায়ে।

গুলি করা ছাড়া উপায় নেই ওদের। মাইন ফেলে রাখায় এগিয়ে আসার পথ বন্ধ ওদের। রানাকে ফাঁদে ফেলতে হলে সান নিকানডো রোডের পাশ দিয়ে পাহাড়ে উঠে আসতে হবে শত্রুপক্ষকে।

হঠাৎ মনে মনে থমকে গেল রানা। জেনে ফেলেছে শত্রু পক্ষ ওর উপস্থিতি। অনুমান করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয় কোন্ পথে উপরে উঠে এসেছে ও। শত্রু সান নিকানডো রোডে পৌঁছে যায়নি তো ইতোমধ্যে? নিচের জ্বালামুখের ডান পাশের ঘরগুলো থেকে কেউ যদি একটা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে থাকে তাহলে ওর তা জানার কথা নয়। গাড়ির শব্দ

শুনতে না পাবারই কথা। প্রধান বাড়িটা থেকেও গাড়ি যেতে পারে।

দ্রুত হাতে অ্যাটাচি কেস বন্ধ করে হামাগুড়ি দিয়ে দ্বিতীয় পাথরটার ওপারে চলে গেল রানা। ছুটে এল একঝাঁক বুলেট।

চারটে রাইফেল একসাথে গর্জে উঠেছে বুঝতে পারল ও। দ্বিতীয় পাথরটার ওপারে গিয়ে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে দ্রুত নামতে লাগল রানা। বুলেট ওর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু সামনে যদি শত্রুপক্ষ সদলে বাধা দেয় তাহলে বাঁচার উপায় কি? একটা রিভলভার ক'জনকে রোধ করতে পারবে?

শত্রুপক্ষ থাকবে নিচে, আত্মগোপন করে। ওকে নামতে হবে নিচের দিকে। আত্মগোপন করে পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব। নামা সম্ভব নয়।

নামতে নামতে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। রাতের আঁধারে শত্রুর মুখোমুখি হওয়াটা স্রেফ বোকামি। দিনের আলোয় অনেক বেশি সাবধান হবার সুযোগ পাবে ও।

যে-পথে নেমে এসেছে সেই পথেই উপরে উঠতে শুরু করল রানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওঠা যায়। কিন্তু পাথরের খাঁজ ধরে ধরে যতটা সম্ভব মাথা নিচু করে উপরে উঠে চলল ও। প্রথম পাথরটা হাত দশেক দূরে থাকতে এগোবার গতি আরও শ্লথ করল ও। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে সামনে বাড়ছে। কুড়ি মিনিট পর প্রথম পাথরটাকে পেরিয়ে দুটো পাথরের মাঝখানে চলে এল রানা আবার।

গুলির শব্দ ত্রিশ মিনিট আগেই থেমে গেছে। নতুন করে আর কোন শব্দ হলো না রাইফেলের। পরিশ্রম সার্থক। ওরা মনে করেছে পালিয়ে গেছে অনাহূত আগন্তুক। জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে নিচের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ডান পাশের ঘরগুলোর দিকে তাকাল রানা। আলোকিত হয়ে উঠছে পুবের আকাশ। সারবাঁধা ঘরগুলোর ছাদের উপর উঁচু পাঁচিল দেখা যাচ্ছে। পাঁচিলের গায়ে ফোকর রয়েছে এক গজ পরপর। ওখান থেকেই গুলি করা হয়েছিল, অনুমান করল ও।

নিঃসাড় পড়ে রইল রানা শক্ত পাথরের ওপর উপুড় হয়ে। মাথাটা খানিক উঁচু করে আবছা আলোয় জ্বালামুখের আশপাশটা দেখার চেষ্টা করল ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

ডান দিকের সরু পথটা হারিয়ে গিয়ে মিশেছে স্টীলের গেটের কাছে। তারপর টানেল শুরু। টানেল গিয়ে শেষ হয়েছে আধ মাইলটাক দূরে। তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে খোলা রাস্তা।

আরও আধ ঘণ্টা পর রানা লোকজনের চলাফেরা লক্ষ করল সারবাঁধা ঘরগুলোর ভিতর। কয়েকটা জানালা খুলে গেল। দু'জন লোক দুটো দরজা দিয়ে দু'মিনিটের ব্যবধানে বেরিয়ে এসে উত্তর দিকে চলে গেল। রানার হিসেবে উত্তর দিকেই বসবাসের জন্য প্রধান বাড়িটা থাকার কথা। নিজের জায়গা থেকে বাড়িটাকে দেখতে পেল না ও। মানাটোফে বাংলোটার নাম দিয়েছে কাসা বিলাভিসটা।

খানিকপর আরও লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল। ঘুম থেকে উঠে বিছানা ছেড়ে যে-যার কাজে হাত দিচ্ছে। ঘরগুলোয় চাকরবাকরদের গতিবিধি টের পেল রানা। বিছানা ঠিকঠাক করে রাখছে তারা। কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। গ্রীষ্মকালীন অবসর বিনোদনের আদর্শ বাংলো ছাড়া আর কিছু সন্দেহ করবার উপায় নেই। কবীর চৌধুরী বা মানাটোফের কোন চিহ্ন দেখল না রানা।

ক্রমে দিনের আলো ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সূর্য উঠল পাহাড়ের আড়ালে। টানেল থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে ভ্যান। মাঝে মাঝে মোড় নিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে সেটা আড়ালে। পাঁচ দশ মিনিট পর আবার দৃষ্টি সীমার মধ্যে মোড় নিয়ে ফিরে আসছে ভ্যানটা। মেন রোডের দিকে নেমে যাচ্ছে ওটা। কাসা বিলাভিসটার প্রধান বিল্ডিং থেকে রওনা দিয়েছে ভ্যানটা।

সময় গড়িয়ে চলেছে ঢিমে তালে। ফেরার কথা মনে থাকলেও কৌতূহল না মিটিয়ে ফিরতে ইচ্ছা করছে না রানার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, অথচ ঘটছে না কিছুই। কিছু না দেখে ফিরে যাওয়াটা মনঃপুত হচ্ছে না ওর।

বেলা তখন দশটা। ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দিকে তাকাল রানা। আরও একটা গাড়ি দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। আগেরটা বহু আগেই নেমে গেছে নিচের মেন রোডে। এটা ভ্যান নয়। উপর দিকে উঠে আসছে মন্থরবেগে।

প্রায় একহাজার গজ দূরে তখনও গাড়িটা। কিন্তু পরিচিত ঠেকল যেন রানার চোখে। বিনকিউলার বের করে চোখে লাগাবার পরমুহূর্তেই পাহাড়ের বাঁকে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। কিন্তু নিজের বেন্টলীকে একপলক দেখেই চিনে নিয়েছে ও।

তিন মিনিট পর আবার দেখা গেল বেন্টলীকে। টানেলের দিকে এগোচ্ছে সেটা। টানেলের ভিতর দিয়ে আধমাইল পথ পেরিয়ে মেন গেটের সামনে এসে দাঁড়াল বেন্টলী। রানার কাছ থেকে মাত্র দুশো গজ দূরে মেন গেট।

প্রায় একই সাথে বেন্টলীর দু'দিকের দরজা খুলে গেল। দু'জন লোক নামল ভিতর থেকে। ড্রাইভার পিছনের দরজা খুলে মাথা নিচু করে গাড়ির ভিতরে কারও সাথে কথা বলে দু'পা পিছিয়ে এল।

রানা পরিষ্কার দেখতে পেল না সোহানাকে।

গাড়ি থেকে ধীরেসুস্থে নামল ও। ড্রাইভার একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু কারও সাহায্য না নিয়েই মেন গেটের দিকে পা বাড়াল সোহানা। ওর মুখের হাবভাব স্পষ্ট দেখতে পেল না রানা দূর থেকে। কিন্তু সোহানা সুস্থ আছে বুঝতে পেরে ভাল লাগল ওর।

মেন গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল সোহানা। এরপর তাকে আর দেখতে পেল না রানা। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। অপর আরোহী সোহানার পিছু পিছু আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আরও একঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও নতুন কিছু দেখার সুযোগ ঘটল না রানার। বিনকিউলার অ্যাটাচি কেসে ভরে হামাগুড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ও

পাহাড় থেকে।

শহরে ঢোকার মুখেই গ্যারেজটা। সরাসরি ম্যানেজারের কেবিনে ঢুকল রানা।

নীল রঙের একটা ফিয়াট ভাড়ায় নিয়ে গ্যারেজ থেকে সোজা হোটেল আলবেরগোর দিকে রওনা হলো ও। গাড়ির ভাড়া বাবদ অগ্রিম দিতে কোনও অসুবিধে হলো না ওর। বুড়ো বস্ ইটালিয়ান কারেন্সি ভরে দিতেও ভোলেনি অ্যাটাচি কেসে।

ছোট শহর লুসেরা। কিন্তু লোকবসতি খুব ঘন। লোকসংখ্যার অর্ধেক প্রাইভেট কার। কড়া রোদেও বাচ্চারা ফুটবল খেলছে রাস্তার ধারে। কাফেগুলোয় মেয়েদের ভিড়। ছাদ-খোলা গাড়িতে করে অর্ধনগ্ন যুবক যুবতীরা রঙিন বল লুফতে লুফতে চলেছে সমুদ্রের দিকে। ফোগিয়া থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরে সমুদ্র-সৈকত।

হোটেল আলবেরগোর তেতলায় একটা রুম পেল রানা। গ্যারেজে গাড়ি তোলার ভার পোর্টারকে দিয়ে সোজা নিজের রুমে উঠে এল ও অ্যাটাচি কেস হাতে নিয়ে। পাঁচ মিনিট পর রুম-বয়কে ডেকে লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে ঢুকল বাথরুমে।

শাওয়ারের নিচে ভিজতে ভিজতে পরিকল্পনা ঠিক করল রানা। যে করে হোক কাসা বিলাভিসটায় আজ বিকেলে যাবে ও। শেষবার কবীর চৌধুরীকে ভেনিসে দেখা গেছে। বর্তমানে লুসেরায় সে আছে কিনা জানা নেই ওর। কিন্তু মানাটোফ সম্ভবত আছে। ওখানে যাওয়া মানে স্বেচ্ছায় বন্দী হওয়া। এছাড়া কোনও উপায় দেখল না রানা। মানাটোফ বা কবীর চৌধুরীর আস্তানায় লুকিয়ে প্রবেশ করা অসাধ্য না হলেও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। পাহাড়ের গায়ে কোথাও না কোথাও অবশ্যই লুকানো গুপ্ত পথ আছে। জার্মানরা গত যুদ্ধে বোমার গুদাম করেছিল মন্টি সোরানোকে। টানেল দিয়ে যাওয়া-আসার রাস্তা ছাড়া অন্তত আর দু'চারটে গোপন পথ তারা তৈরি করেছিল নিশ্চয়ই। মৃত আগ্নেয়গিরির ভেতর বিপদের সময় আটকে মরার ইচ্ছা তাদের থাকার কথা নয়।

কিন্তু পথ আবিষ্কার করে কাসা বিলাভিসটায় পৌঁছুতে হলে প্রচুর সময়ের দরকার। হয়তো চার-পাঁচদিন লেগে যাবে।

তারচেয়ে বন্দী হওয়া ভাল। কবীর চৌধুরী আগ্নেয়গিরির পেটের ভিতর আস্তানা গেড়ে কি কাজে ব্যস্ত তা জানার সুযোগ পাবে ও। সোহানার সাথেও দেখা হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

লাঞ্চ সেরে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল রানা। রুম-বয়কে বলে রেখেছে আগেই, সময়মত ডাকবে সে।

কিন্তু কেউ ডাকার আগেই ঘুম ভেঙে গেল ওর। ঝট্ করে বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা হাতে নিল ও। কান পেতে শোনবার দরকার হলো না। শব্দটা জোরেশোরেই হচ্ছে। কাগজের শব্দ। খস্-খস্স্-খস্-খস্-খস্স্।

সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে ব্যালকনির দিকের দরজাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল

রানা। তালা খুলে ফেলল ও নিঃশব্দে। তারপর আচমকা নব ধরে টান মারতেই দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল। মুচকি হাসল ও।

ব্যালকনিতে আটকে গেছে একটা ঘুড়ি। রিভলভারটা বিছানার উপর ছুঁড়ে দিয়ে ব্যালকনির রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল ও। দুটি ছেলে তাকিয়ে আছে উপর দিকে। একজনের হাতে একটা লাটাই। দু'ভাই হবে ওরা। দু'জনেই ছোট। একজন দশ-এগারো, অন্যজন আট নয় বছরের। রানাকে দেখে পরস্পর কি যেন বলাবলি করল। বড় ছেলেটি উপর দিকে তাকাল আবার। রানার মেজাজ বোঝার চেষ্টা করছে সে। তারপর জোরে চিৎকার করে কি যেন বলল। ঘুড়িটা ছাড়িয়ে দেবার অনুরোধ।

একটু ভাবল রানা। ঘুড়িটা ছিঁড়ে গেছে রেলিঙের এপারে আটকে গিয়ে। ওরা জানে না এখনও। ছেঁড়া ঘুড়ি দেখে মন খারাপ হয়ে যাবে বেচারাদের।

ছেলেটির অনুরোধের উত্তরে হেসে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত করল রানা। ব্যালকনি থেকে রুমের ভিতর চলে গেল ও। কয়েক সেকেন্ড পর বেরিয়ে এসে ছেঁড়া ঘুড়িটা ছাড়াল রেলিং থেকে। তারপর সুতোর সাথে বেঁধে দিল একটা ইটালিয়ান নোট। এদেশের আড়াই টাকার সমান মান নোটটার।

ছেঁড়া ঘুড়িসহ নোটটা ছেলে দুটোর হাতে পৌঁছুল। দু'জনেই অবাক হয়ে তাকাল রানার দিকে। বড় ছেলেটি কি যেন বলল ছোটটিকে। প্রবল বেগে মাথা নাড়ল ছোট ছেলেটি। হাসি পেল রানার। ছোট ছেলেটির হাবভাব দেখে বুঝতে পারছে ও, টাকাটা ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি নয় সে। বড় ছেলেটি আরও কি সব বলছে তাকে। রানা দেখল পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুটো চকোলেট বের করল ছোট ছেলেটি। বড়টিও তাই করল। তারপর রানাকে চকোলেটগুলো দেখিয়ে নিজেদের ভাষায় বলল, 'আপনাকে আমাদের এই চকোলেটগুলো নিতে হবে।'

রানা দু'হাত একত্রিত করে লুফে নেবার ভঙ্গি করে বলল, 'ছুঁড়ে দাও, দেখি ধরতে পারি কিনা।'

চকোলেটগুলো ঘুড়ির কাগজে মুড়ে ছুঁড়ে দিল বড় ছেলেটি। কিন্তু অত উঁচুতে উঠল না প্যাকেটটা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও ব্যর্থ হলো সে।

'থাক, অন্য কোন সময় দিয়ো, কেমন?' হেসে ফেলে বলল রানা।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছেলে দুটো। রানা ফিরে এল রুমে। দরজায় নক হলো তখনই। রুম-বয় সময় মতই এসেছে। রানা দরজা না খুলেই বলল, 'কফি নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি।'

'দরজাটা খুলুন, স্যার,' বাইরে থেকে বলল রুম-বয়। 'আপনার একটা চিঠি আছে।'

চিঠি?

বিস্মিত ভাবটা প্রকাশ না করে দরজা খুলল রানা। একটা খাম এগিয়ে দিল রুম-বয়। রানা হাত বাড়িয়ে খামটা নিতেই চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে। ওকে বাধা দিল রানা, 'কে নিয়ে এসেছে এই চিঠি? কখন?'

'আধঘণ্টা আগে একটা লোক এসেছিল, স্যার। আমি তখন ম্যানেজারের

চেম্বারে ছিলাম। সাদা একটা মরিস গাড়ি করে এসেছিল। আপনার নাম করে দিয়ে গেছে চিঠিটা। ম্যানেজার তখনই দিয়েছিল ওটা আমাকে আপনার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে।' অপরাধী ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল ছেলেটা। 'দুঃখিত, স্যার। সাথে সাথে পৌঁছে দেয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করা হবে ভেবে...'

'ঠিক আছে, তুমি কফি নিয়ে এসো।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে খামের উপর লেখাটা পড়ল রানা। পরিষ্কার ইংরেজীতে টাইপ করা—টু মেজর মাসুদ রানা। হোটেল আলবেরগো, রুম নাম্বার নাইনটিন, সেকেন্ড ফ্লোর। লুসেরা।

খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করল রানা। সম্বোধনের জায়গায় 'বন্ধুবরেষু মাসুদ রানা' লেখা। চিঠির শেষে লেখা, 'তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী কবীর চৌধুরী।'

দুটোই মিথ্যে কথা। মনে মনে হাসল রানা। কবীর চৌধুরী বন্ধু নয়, শুভাকাঙ্ক্ষী তো নয়ই।

কিন্তু হাসি নিভে গেল ওর ঠোঁট থেকে। ধরা পড়ে গেছে ও। এত সাবধানে ইটালিতে ফিরে এসেও শয়তানটার চোখকে ফাঁকি দেয়া গেল না।

কবীর চৌধুরী লিখেছে:

'ভেনিস থেকে ফিরেই আমি শুনলাম খানিক আগে ফোগিয়া এয়ারপোর্টে একটা প্লেন ল্যান্ড করার প্রায় সাথে সাথে আবার উড়ে গেছে। প্লেনটা বি. ও. এ. সি-র জানতে পেরেই আমি বুঝলাম মাসুদ রানা এই অপ্রত্যাশিত ল্যান্ডিঙের সাথে জড়িত।

'আমার ফোগিয়ার বন্ধুবান্ধবেরা খুব অল্প সময়ে খুঁজে বের করেছে তোমাকে।

'আশা করেছিলাম বটে তুমি আবার ইটালিতে ফিরে আসবে অচিরেই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তা অবশ্যই ভাবিনি। যাক, আমার জন্যে ভালই হয়েছে বলতে হবে। মিস সোহানা প্রতি মুহূর্তে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের যে-কোন এজেন্টকে আশা করছে আমার আস্তানায়। ওকে উদ্ধার করার জন্যে মেজর জেনারেল রাহাত খান লোক পাঠাবে একথা ভাবা ওর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। রাহাত খান ওকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে তা তো আর ওর অজানা নেই।

'অন্য যে-কোন এজেন্টের চেয়ে তোমার ওপর আস্থা মিস সোহানার বেশি। ইতোমধ্যেই সে তোমার নাম শুনিয়ে ভয় দেখিয়েছে আমাকে দু'বার। ও খুশি হবে তোমার উপস্থিতিতে। বিশ্বাস করো, আমিও খুশি হব। ভয় পেয়ো না, তোমাকে আমি এই মুহূর্তে অতিথি হিসেবেই চাই।

'সান মারকো রোড ধরে সোজা গাড়ি চালিয়ে এলে একটা লজ দেখতে পাবে। গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করালেই আমাকে পেতে কোনও অসুবিধে হবে না তোমার।

'তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী কবীর চৌধুরী।'

সাত

রুম-বয় কফি পট সাজিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। রানা বলল, 'গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করতে বলো। আমি নামছি।'

সম্মতি জানিয়ে রুম-বয় চলে যেতে কফির পেয়ালায় চুমুক দিল রানা আয়েশ করে। এ বরং ভালই হলো। কবীর চৌধুরী না ডাকলেও যেতে হত ওকে।

কিন্তু খুঁতখুঁতে ভাবটা দূর হলো না মন থেকে। কেন এই আহ্বান? কবীর চৌধুরী আশা করল কেন ডাকলেই সুড়সুড় করে গিয়ে হাজির হবে সে?

প্রশ্নটা ওর মনকে ক্ষতবিক্ষত করার পক্ষে যথেষ্ট। হঠাৎ বুঝতে পারল রানা। ঠাট্টা করেছে কবীর চৌধুরী। হ্যাঁ, ক্ষমতার দম্ভে ঠাট্টা করেছে শয়তানটা।

লুসেরা শহরের ভিতর যে-কোন কুকাজ করার মত ক্ষমতা কবীর চৌধুরীর আছে। রানাকে জোর করে নিজের মুঠোয় নিয়ে যাওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না তার পক্ষে। কিন্তু জোর করার আগে খেলাচ্ছলে চিঠিটা পাঠিয়েছে সে। রানা যদি না যায় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা সে নেবে। ঠাট্টা ছাড়া আর কি!

নিচে নেমে গাড়িতে ওঠার আগেই কচি কণ্ঠের চিৎকার শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। সেই দুই ছেলে ছুটে আসছে ওর দিকে। দু'জনের হাতে দুটো নতুন ঘুড়ি। রানার পাশে এসে দাঁড়াল দুইজন। গালভরা হাসি ওদের মুখে। রানা কথা না বলে ডান হাতটা পাতল ওদের সামনে। পকেট থেকে মুঠো ভর্তি চকোলেট বের করে ওর হাতের মাঝখানে রাখল বড় ছেলেটি। ছোট ছেলেটিও একমুঠো চকোলেট বের করল। টাকা ভাঙিয়ে ঘুড়ি আর চকোলেট কিনে হোটেলের আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল ওরা রানা যদি নিচে নামে সেই আশায়।

চকোলেটগুলো পকেটে ভরে দু'জনার গাল টিপে আদর করে রানা বলল, 'লক্ষ্মী ছেলে তোমরা। এবার যাও।'

'তা আমরা যাচ্ছি,' বড় ছেলেটি আবদার করে বলল, 'কিন্তু আগামীকাল আমার জন্মদিনের পার্টিতে দাওয়াত তোমার। যাবে তো? এই তো কাছেই আমাদের বাড়ি। দুশো তেরো নম্বর, চারটে বাড়ি পরই।'

'অবশ্যই,' হাসি মুখে বলল রানা। 'কিন্তু আমি একটা কাজে অন্য জায়গায় যাচ্ছি। কবে ফিরব জানি না। ফিরলে দেখা করব, কেমন?'

ছোট ছেলেটি সম্মতি জানিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা কোরো।'

ছেলে দুটো ধীর পায়ে চলে যেতে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রানা। পাঁচ

সেকেন্ড পর পেছন থেকে শব্দ হলো আর একটি গাড়ি স্টার্ট নেবার। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। একশো গজ পিছনে ফোক্সওয়াগেন গাড়িটা। দু'জন আরোহী।

গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রাখল ও।

পিছনের গাড়িটা অনুসরণ করতে শুরু করেছে।

আধমাইলটাক এগিয়ে সামনের রাস্তার ধারে পার্ক করা সাদা মরিসটাকে দেখল রানা। ওর ফিয়াট সেটাকে পেরিয়ে যাবার আগে ছেড়ে দিল মরিস।

তেমাথার কাছে পৌঁছে সাদা মরিস মেন রোডের ওপর আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাশেই একটা গলি। পিছনের ফোক্সওয়াগেন ওভারটেক করল ফিয়াটকে। সরু গলিতে ঢুকে গেল সেটা। রানা ফিয়াট নিয়ে গলি ধরে খানিক দূরে এগোবার পরই আবার পিছনে দেখা গেল সাদা মরিসকে।

কবীর চৌধুরী কাসা বিলাভিসটার সামনের দরজায় অপেক্ষা করছিল। ফোক্সওয়াগেনটা পশ্চিম দিকের উঁচু ঢিবির উপর উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাসি মুখে দু'পা এগিয়ে এসে নির্ভয়ে ফিয়াটের দরজা খুলে ফেলল কবীর চৌধুরী, 'গুড ইভনিং, রানা। তোমার সুবুদ্ধি দেখে খুশি হয়েছি আমি।'

শত্রুতামূলক কোনও হাবভাব প্রকাশ পেল না কবীর চৌধুরীর ব্যবহারে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করছে সে গোটা ব্যাপারটাকে।

গাড়ির ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল রানা। কবীর চৌধুরীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরাসরি তাকাল ও কোলে কালি পড়া এক জোড়া চোখের দিকে।

'আমার ধারণা, মিস সোহানাকে দেখতে চাও তুমি। কিন্তু তার আগে তোমার সাথে কথা আছে আমার,' বলল কবীর চৌধুরী।

'আমি তৈরি,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'কেন এখানে নিয়ে এসেছ আমাকে সেটাই জানতে চাই।'

'উইল ইউ ফলো মি?' উঁচু ঢিবির পাশ দিয়ে আগে বাড়ল কবীর চৌধুরী। দরজা পেরিয়ে বড় একটি সুসজ্জিত ঘরের ভিতর ওর পিছু পিছু ঢুকল রানা। আসবাব-পত্র দেখে অফিস রুম বলে মনে হলো। বিরাট একটা টেবিলের ধারে কয়েকটা চেয়ার।

'প্লীজ সীট ডাউন, রানা।' কবীর চৌধুরী টেবিলের অপর দিকে গিয়ে দাঁড়াল। কয়েক দফায় কয়েকটা বিষয় ব্যাখ্যা করব আমি—সেসব পরে হবে। তার আগে বলো, আমাকে বেঁচে থাকতে দেখে কী রকম চমকে গেছ তুমি?'

'না, খুশি হয়েছি আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'তোমাকে নিজের হাতে খুন করার নতুন সুযোগ পাওয়া গেছে একটা। সুযোগটা হাতছাড়া না করার চেষ্টা করব আমি।'

'এতটুকু বদলাওনি তুমি, তাই না?' কবীর চৌধুরী গম্ভীর হলো, 'কিন্তু বদলাতে হবে তোমাকে, রানা।'

'কি বলতে চাও বলে ফেলো, চৌধুরী,' অসহিষ্ণু গলায় বলল রানা,

'ভণিতা করছ কেন?'

ধীরে ধীরে বদলে গেল কবীর চৌধুরীর চেহারা। রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ খুলল। 'তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, রানা,' কবীর চৌধুরী শান্ত অথচ ভারী গলায় বলল, 'কারণ আমি বিশ্বাস করি বর্তমানে যে অসীম গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমি হাতে নিয়েছি তাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার জন্যে তোমার সাহায্য আমার একান্ত ভাবে দরকার। আমি জানি আমার সম্পর্কে তোমার মনোভাব কি রকম। কিন্তু, বিশ্বাস করো, আমার উচ্চাশা এমনই মূল্যবান যে সব কথা জানার পর আমাকে সমর্থন না করে পারবে না তুমি। এমন কিছু বলার আছে আমার যা শুনে আমাকে সাহায্য করার জন্যে তুমি নিজেই ব্যাকুল না হয়ে পারবে না। কিন্তু সে সব আরও পরের ব্যাপার।' টেলিফোন রিসিভারের উপর হাত বোলাতে বোলাতে গভীর ভাবে কিছু ভাবল কবীর চৌধুরী। তারপর আবার বলল, 'আমাকে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই তোমার। কিন্তু ভুলো না, আমি এমন এক প্রচণ্ড ক্ষমতা হাতে নিয়ে কথা বলছি যে, মিথ্যা কথা বলার কোনও প্রয়োজন আমার নেই। বলব সব তোমাকে—দেখাব, নিশ্চয়—কিন্তু তার আগে, তোমার বিশ্রাম দরকার। বিশ্রাম নিতে যাবার আগে, রানা, আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'বলে ফেলো,' কৌতূহল প্রকাশ না করে বলল রানা, 'আমি শুনছি।'

রানার কথা যেন শুনতে পায়নি কবীর চৌধুরী। চেহারা বা কণ্ঠস্বরের কোনও পরিবর্তন নেই, 'হিয়ার ইজ মাই প্রোপোজাল। আগামী চব্বিশ ঘণ্টা আমার পরিকল্পনায় কোনও রকম হাত বা বাধা দেবার চেষ্টা কোরো না। এই সময়টা তুমি দেখে, এবং শুনে, বোঝার চেষ্টা করো কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি আমি, আর শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। যদি চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর যুক্তি দিয়ে তোমাকে বোঝাতে না পারি আমি তাহলে··· সে তখনকার সমস্যা তখন সমাধান করা যাবে। আমার প্রস্তাবে যদি তুমি রাজি থাকো তাহলে তুমি আর সোহানা আমার ঘনিষ্ঠ সহচর এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে থাকতে পারবে। কোথাও যেতে তোমাদের বাধা নেই, কেউ তোমাদের অসম্মান করবে না, আরাম-আয়েশের সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা করা হবে তোমাদের জন্যে। নিরস্ত্র থাকার এই প্রস্তাব দিচ্ছি তোমাদের স্বার্থে। আমার সদা সতর্ক প্রহরীদের হাতে মারা পড়ো এটা আপাতত চাইছি না আমি। কোন রকম বদ মতলব প্রকাশ পেলেই মেরে ফেলা হবে তোমাদের।'

বিরক্ত কণ্ঠে জবাব চাইল রানা, 'যদি রাজি না হই?'

'ছেড়ে দেব তোমাকে।' কবীর চৌধুরী হাসল, 'কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হবে না তোমার। আমার পছন্দসই ব্যবস্থা করব তখন কাজ উদ্ধারের জন্যে। তোমাকে আবার আমার হাতে পড়তে হবে। তখন আমার কোনও প্রস্তাব থাকবে না।'

'সোহানাকে নিয়ে কি করবে বললে না?' ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'ওর মাথাটা পার্সেল করে পাঠিয়ে দেব লন্ডনে তোমাদের এমব্যাসিতে।

মেজর জেনারেল রাহাত খান আধমিনিট অন্তত হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে পার্সেল খুলে,' নির্বিকার গলায় বলল কবীর চৌধুরী।

তা পারে শয়তানটা। হত্যায় কুণ্ঠা নেই কবীর চৌধুরীর। রানা সংযত করল মেজাজকে। 'বেশ,' বলল ও। 'আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার কোন কাজেই বাধা দেব না। কিন্তু সোহানার সাথে দেখা না হওয়ার আগে ওর সম্পর্কে কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছি না আমি।'

'তুমি বোঝাতে পারবে ওকে।' কবীর চৌধুরী হাসল নিঃশব্দে, 'তোমার আদেশ ও অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।' ফোনের রিসিভার তুলে বলল, 'ফ্যালকন? মিস সোহানার রুমে যাবেন মি. রানা। ওকে সাথে করে নিয়ে যাও।' রিসিভার নামিয়ে রেখে অন্দরমহলের দরজার দিকে ইঙ্গিত করল কবীর চৌধুরী, 'তুমি যেতে পারো, রানা।'

চেয়ার ছেড়ে ধীর পায়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। তারপর ঝট্ করে পিছন ফিরে তাকাল ও, 'তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে, চৌধুরী। আজ হয়তো নয়—কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না আমি। তুমি আর আমি এক সাথে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারি না। তোমাকে মরতে হবে।'

খেপে ওঠার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না কবীর চৌধুরীর মাঝে। হেসেও উঠল না সে। দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, 'মানি না কথাগুলো। সব শোনার পর তুমি মত বদলাবে। আমি শিওর।'

দরজা খুলে বাইরের করিডরে পা ফেলে রানা এই প্রথম প্রশ্ন করল নিজেকে! কি এমন কথা বলতে চায় কবীর চৌধুরী? এমন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস কোথা থেকে পাচ্ছে সে? ভিত্তিহীন কোনও জিনিসের উপর নির্ভর করে বড়াই করা কবীর চৌধুরীর স্বভাব নয়। উদ্বেগ বোধ করল রানা।

ফ্যালকনের দু পকেটে দুটি পিস্তল। করিডরে এসে দাঁড়িয়েছে সে। রানা তাকাতেই মাথা হেঁট করে অগ্রসর হবার জন্যে ইঙ্গিতে পথ দেখাল সে।

লিফটে চড়ে দোতলায় উঠল রানা। সোহানার রুম ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। ফ্যালকন মৃদু শব্দে টোকা মারল দরজার গায়ে। ঝাঁঝাল গলা শোনা গেল ভিতর থেকে, 'কে? কেন বিরক্ত করছ আমাকে?'

ফ্যালকন বিনীত ভাবে বলল, 'মাফ করবেন, মিস সোহানা, মি. মাসুদ রানা আপনার দর্শনপ্রার্থী।'

আর কোন শব্দ এল না ভিতর থেকে। আধ মিনিট পর খুট্ করে খুলে গেল দরজা।

ফ্যালকন সামান্য একটু নত হয়ে সম্মান জানাল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডর ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সোহানা সরে দাঁড়িয়ে ঢোকার পথ করে দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'ভিতরে এসো, রানা।'

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। সোহানাকে সুসজ্জিত রুম দিয়েছে কবীর চৌধুরী। ড্রয়িংরুমের খোলা দরজা দিয়ে বেডরুমটা দেখা যাচ্ছে। সোফা সেট, টি. ভি, রেডিও, ফোন, স্টীলের আলমারি—সব আছে। শাড়ির বদলে প্যান্ট পরেছে সোহানা। লাল রঙের প্যান্টের সাথে হাফ-হাতা

সাদা শার্টে মানিয়েছে ওকে।

সোফায় বসে পকেট থেকে চেস্টারফিল্ডের প্যাকেট বের করল রানা। সিগারেট ধরিয়ে তাকাল সোহানার দিকে। ওকে লক্ষ করছে সোহানা। সোহানাই আবার কথা বলল, 'কেমন আছ, রানা?'

'তুমি কেমন আছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'দেখতেই পাচ্ছ, শয়তানটার খপ্পরে রয়েছি,' নির্বিকার ভাবে বলল সোহানা।

'মুঠো থেকে কাল পালিয়েছিলাম। আজ আবার ধরা পড়েছি।'

'দুঃখ হয় তোমার জন্যে, রানা।' রানাকে বাঁকা কথা বলার অভ্যাসটা যেন ত্যাগ করতে পারছে না সোহানা, 'কাজের মানুষ হলে এই হয় বিপদ। ছিলে ছুটিতে। কারও সাতে পাঁচে ছিলে না। কাজটা নিয়ে এলাম আমি। অথচ তোমাকেও ওরা বাদ দিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি ছিলে ভেনিসে। তাছাড়া শত্রুপক্ষ তোমাকে ভাল করেই চেনে। যমের মত ভয় করে ওরা তোমায়। সেটাই হলো কাল।'

নিঃশব্দে রানা হাসল একটু, 'তোমার কাজের কতদূর কি হলো, সোহানা?' হঠাৎ চিন্তিত হয়ে উঠল ও, 'এয়ারক্র্যাফটটা দেখেছ নাকি?'

পাঁচ সেকেন্ড রানার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল সোহানা। তারপর বলল, 'এয়ারক্র্যাফটের কথা তুমি জানলে কোথা থেকে?'

'জানি।' মুচকি হাসল রানা, 'তুমি কতদূর এগিয়েছ তাই বলো।'

রানার মুখোমুখি সোফায় বসল সোহানা। লাল ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো একটু। হাসছে ও, 'বলব না। এটা আমার অ্যাসাইনমেন্ট। তুমি এর মধ্যে কেউ নও।'

পকেট থেকে একটুকরো লম্বা কাগজ বের করল রানা ধীরে ধীরে। রাহাত খান অনেক জিনিসের সাথে নিজের হাতে সই করা এই কাগজটাও ভরে দিয়েছেন ওর অ্যাটাচি কেসে। কাগজটায় চোখ রাখল রানা।

আধ মিনিট পর অধৈর্যভাবে প্রশ্ন করল সোহানা, 'কি ওটা?'

'দেখতে চাও নাকি?' কৌতুক নাচছে রানার দুই চোখে। কাগজটা সোহানার দিকে বাড়িয়ে দিল ও।

কাগজের আড়ালে সোহানার মুখটা দেখতে পেল না রানা। ওটা পড়তে পড়তে লাল হয়ে উঠেছে সোহানার সারা মুখ। ওতে লেখা কথাগুলো বাংলা করলে দাঁড়ায়: 'সোহানা, প্রথম সুযোগেই ফিরে এসো লন্ডনে। রানা সব দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে।'

'এক্সকিউজ মি, রানা। তোমাদের বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি লজ্জিত,' কবীর চৌধুরীর গলা ভেসে এল লুকানো লাউডস্পীকারে। 'কিন্তু তোমার সবরকম আরামের দিকে দৃষ্টি রাখা আমার কর্তব্য। তাই বলছি তোমাকে যে-সব কথা বলব বলে জানিয়েছি সে-সব নিয়ে দুশ্চিন্তা করে খামোকা রাতের ঘুমটুকু নষ্ট কোরো না। কাল সকালেই সব জানতে পারবে তুমি। বিরক্ত করলাম বলে আর একবার ক্ষমা চাইছি। গুড নাইট।'

কোন মন্তব্য করল না রানা। ওর মুখের চেহারা শুধু কঠিন হয়ে উঠেছে দেখল সোহানা। সোহানাই কথা বলল, 'সরি, রানা। সত্যি কথা বলছি তোমাকে, কিছুই এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি আমি। কবীর চৌধুরী কড়া পাহারায় রেখেছে আমাকে। প্রতিটি দেয়ালে ট্র্যান্সমিটার বসানো, সব সময় চোখে চোখে রেখেছে…'

নিবিড় ঘুম দিয়ে বেলা সাতটায় চোখ মেলল রানা।

কাপড়চোপড় পরে বাইরে বেরিয়ে গেলে কেউ বাধা দেবে কিনা ভাবল ও। বাড়ির ভিতর চলাফেরার শব্দ কানে আসছে। ঘুম ভাঙার পাঁচ মিনিট পরই দরজায় টোকা পড়ল। ওরা কি লক্ষ্য করছিল ওকে?

একজন উর্দিপরা বেয়ারা ট্রে হাতে ভিতরে ঢুকল রানার ডাকে।

'গুড মর্নিং, স্যার,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল বেয়ারা, 'ঈল কাপো জানিয়েছেন আধ ঘণ্টার মধ্যে খোলা ছাদে আপনাকে পেলে তিনি খুশি হবেন।' ঈল কাপো কবীর চৌধুরীর ইটালিয়ান নাম।

হলের ঘড়িতে ঢং করে একটি শব্দ হলো। খোলা ছাদে কবীর চৌধুরী বসে রয়েছে, হলের দরজা পেরিয়ে সামনে চোখ মেলেই দেখল রানা।

বাতাস নেই এক ফোঁটা। রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল। পশ্চিম উপত্যকার নিচে ছোট পর্বতগুলো আবছা দেখাচ্ছে ভোরের কুয়াশায়।

কবীর চৌধুরী সহাস্যে আহ্বান জানাল ওকে। 'আমরা পরস্পরকে পছন্দ করি না, রানা,' বলল সে। 'আমি জানি সুযোগ পেলে আমাকে খুন করবে তুমি। সোহানা তারপর বাঁচবে না—একথা জেনেও সুযোগ হারাবে না তুমি। আমিও তোমার সম্পর্কে সেইরকম মনোভাব পোষণ করি। কিন্তু এই মুহূর্তে পরস্পরের সহকর্মী হওয়া দরকার। আমাদের নিজ নিজ স্বার্থেই তা দরকার।'

রানা অল্প একটু হাসল, বলল, 'ওসব কথা বাদ দাও। কি যেন বলতে চাও তুমি?'

'অনেক কথা বলতে চাই। এ জায়গাটা কেমন? বসব কি আমরা?'

দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, টেবিলের উপর টেলিফোন। টেলিফোন ছাড়া এক কদম নড়ে না কবীর চৌধুরী। ওরা বসল।

'আমার উদ্দেশ্য কি বলতে চাই। ইতিমধ্যে প্রচুর কাজ করে ফেলেছি। লক্ষ্য হাসিলের জন্যে হাতিয়ার অর্জন করেছি। আমার উদ্দেশ্য কি জানো, রানা? এই পৃথিবীর মানবকুল যাতে নিজেদের ধ্বংস না করতে পারে তার একটা কার্যকরী ব্যবস্থা করা। আশা করি এক কথায় তুমি আমার সাথে একমত হবে। এটা একটা রিয়েল ডেঞ্জার।'

কোনও মন্তব্য করল না রানা।

'ভয় পৃথিবীকে শাসন করে,' বলে চলল কবীর চৌধুরী, 'পৃথিবীর ভাল মানুষেরা এই সঙ্কট থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার পথে এক পা এক পা এগোচ্ছে। একদিন সে চুক্তি বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু তাতে কতটা ফল পাবে পৃথিবীর মানুষ? বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে আর কত দিন লাগবে? আসলে

পৃথিবীর যে-কোন রাষ্ট্রের কাছে মানবজাতিকে ধ্বংস করার মত হাতিয়ার থাকা পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি বা "যুদ্ধ নয়" চুক্তি যত বারই সম্পাদিত হোক না কেন—পৃথিবীর মানুষ নিরাপদ বোধ করতে পারে না। তুমি একমত?'

রানা বলল, 'অনেকটা। তোমার কথা শেষ করো আগে।'

'চার-পাঁচটা রাষ্ট্রের হাতে এই পৃথিবীর মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। অদূর ভবিষ্যতে মোট এক ডজন রাষ্ট্র আল্‌টিমেট উইপন তৈরি করতে এবং তা ব্যবহার করতে শিখবে। বারোটি রাষ্ট্রের বারোজন রাষ্ট্র প্রধানের যে-কোন একজন ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ব্যবহার করতে পারে চরম অস্ত্র। যার পরিণতি মানবজাতির সম্পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।'

রানার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল কবীর চৌধুরী, 'অ্যাক্সিডেন্টকেও ভুলে গেলে চলবে না। চরম অস্ত্র যাদের কাছে থাকছে তারা কাজে লাগিয়েছে কিছু টেকনিশিয়ানদের। তাদের কাজ বোমা নিক্ষেপ করা, রকেট ছোঁড়া কিংবা নির্দিষ্ট একটি বোতাম টেপা। কেউ আতঙ্কে, কেউ পাগল হয়ে গিয়ে, কেউবা স্রেফ নিজের অজ্ঞাতে বোধবুদ্ধি হারিয়ে টিপে দিতে পারে বিপজ্জনক ভয়ঙ্কর বোতামটা। উড়িয়ে দেয়া যায় কি দুর্ঘটনার আশঙ্কা?'

কবীর চৌধুরী উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। কথা বলার সময় চোখমুখের রেখা থেকে থেকে বদলে যাচ্ছে তার। লোকটা যে আন্তরিক সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ রইল না রানার। ও বলল, 'নতুন আর কি বললে তুমি? যা বললে তা সবই সত্যি। এ সমস্যার কোনও সমাধান নেই।'

'শোনো, বন্ধু,' নিজের চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে দুই হাতলের উপর ভর দিয়ে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল কবীর চৌধুরী, 'রাজনীতিকরা যখন বৈঠকখানায় মীটিঙের পর মীটিং করেছে, আমি তখন কাজ করেছি। সেজন্যেই তোমাকে এখানে এনেছি। কারণ সমাধান পেয়ে গেছি আমি এবং তুমি আমার অনেক যন্ত্রের মধ্যে একটি।' কবীর চৌধুরী চেয়ারে বসল। 'প্রথম থেকে সব শোনো তুমি, রানা। তাহলে বুঝতে পারবে। বর্তমানে পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত—দুটো ব্লক। দুই ব্লকের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সবার জানা। দু'দলের কাছেই আছে চরম অস্ত্র, মানবজাতিকে একদম ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট।'

টেবিলের উপর থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে গলায় এক ঢোক পানি ঢালল কবীর চৌধুরী, 'তৃতীয় একটি ব্লক সৃষ্টি করার মত সম্পদ এবং টেকনিক্যাল নলেজ আমি সংগ্রহ করেছি। প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আর সম্পদশালী বহু লোককে আমি সাহায্যকারী হিসেবে পেয়েছি, যারা প্রধান দুই ব্লকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে তাকে ঘৃণা করে এবং তাদের প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করার জন্যে যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। হাইড্রোজেন বোমার দ্বারা যে আতঙ্ক জনজীবনে ছড়িয়ে পড়েছে তাকে চিরতরে নষ্ট করে দেবার যে কোন প্রচেষ্টায় তারা আগ্রহী ছিল, আমি তাদের আগ্রহকে কাজে লাগিয়েছি।'

রানার দিকে নিষ্পলক কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কবীর চৌধুরী। তারপর আবার শুরু করল, 'আমার মাথার ভিতর চব্বিশ ঘণ্টা আলোড়িত হচ্ছিল এমন একটি অস্ত্র তৈরি করার চিন্তা যা হাইড্রোজেন বোমাকে ছাড়িয়ে

যাবে। একটিমাত্র হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করার জন্যে প্রচুর টাকা, মূল্যবান বহু ব্রেন এবং জিনিসপত্র দরকার। তারপর তৈরি করার সময় সামান্য এতটুকু ভুল হলে অবিশ্বাস্য দুর্ঘটনা ঘটে যাবার আশঙ্কা। বোমা গুদামজাত করাটাও প্রকাণ্ড এক সমস্যা। এতগুলো ঝামেলা সৃষ্টি করে যে-বস্তু সেটা চরম ধ্বংসাত্মক অস্ত্র হতে পারে না, এই ছিল আমার ধারণা। তাই হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করার কথা ভাবা আমি ছেড়ে দিলাম। তার বদলে আমি ভাবতে আরম্ভ করি এমন কোন জিনিস আবিষ্কার করা সম্ভব কিনা, যা হাইড্রোজেন বোমাকে, যে-কোন দূরত্ব থেকে, যে-কোন আবহাওয়ায় অকেজো করে দেয়া যায়। কিংবা সেগুলোকে ফাটিয়ে দেয়া যায়। যদি যায় তাহলে নিউক্লিয়ার বোমা মূল্যহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। অসহনীয় আতঙ্কের এবং নিরাপত্তা বোধহীনতার হাত থেকে পৃথিবীর মানুষ চিরতরে বেঁচে যাবে তাহলে।'

আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। আবেগে কাঁপছে তার দুই হাত। ঠিকরে বেরুচ্ছে চোখ দুটো।

'আমি সফল,' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আমার হাতে এমন সব যন্ত্র আছে যা দিয়ে যে-কোন রাষ্ট্রের যে-কোন জায়গায় হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে দিতে পারি আমি। আমি এক বাস্তব বিভীষিকা এই মুহূর্তে। আমি এক মহাবিপদ, এই বিপদের মুখোমুখি হবার ক্ষমতা পৃথিবীর কারও নেই। তোমার সহযোগিতা পাবার জন্যে এটুকুই কি যথেষ্ট নয়, রানা, মাই ফ্রেন্ড?' সশব্দে ফের চেয়ারে বসে পড়ল কবীর চৌধুরী। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল সে।

শান্তভাবে কথা বলার চেষ্টা করল রানা, 'দাবি করছ অনেক দূর এগিয়েছ তুমি। তোমাকে বিশ্বাস করব কেন আমি?'

হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল কবীর চৌধুরী। মৃদু হাসল, 'অর্জন না করলে অত বড় দাবি করতাম না,' বলল সে। 'কিন্তু আমার সমস্যার নার্ভে আঙুল রেখেছ তুমি। আমি যা অর্জন করেছি তা সামান্য নয়। গোটা পৃথিবীকে হতভম্ব করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আমার কথা? সরাসরি কোন রাষ্ট্রকে যদি আমার কথা জানাই তাহলে সে-কথায় গুরুত্ব দেয়া তো দূরের কথা, আমাকে বদ্ধ পাগল ঠাওরাবে তারা। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তুমি বি. সি. আই-এর এজেন্ট, এবং বি. সি. আই-এর চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান। রাহাত খানকে যদি তুমি ঠিক ঠিক বোঝাতে পারো তাহলে সে ঠিক ঠিক বোঝাতে পারবে তার এবং বিদেশের অন্যান্য রাষ্ট্র প্রধানকে। আর আমার দায়িত্ব তোমাকে বোঝাবার। কথায় বলব, চোখেও দেখাব। আমার গল্পের কথায় ফিরে আসি আবার। আমার দ্বিতীয় সমস্যা ছিল পৃথিবীব্যাপী বিস্ফোরণমূলক বস্তু কোথায়, কি পর্যায়ে আছে তার একটি তালিকা তৈরি করা। অর্থাৎ আণবিক বোমা তৈরি করার কাজ কোথায় কি পর্যন্ত এগিয়েছে এবং তৈরি বোমার বেস্ বা গুদামের তালিকা করা। খুব অল্প সময়ের ভেতর তালিকা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি আমি, সর্বত্র রয়েছে আমার ডান হাত-বাঁ হাতের বিরাট কাহিনী। আমি আশ্চর্য হয়েছি ফ্রান্সের আণবিক বোমা গুদামজাত করার খরচ বহুল অত্যাধুনিক পদ্ধতি জেনে। ফ্রান্স এই তো সেদিন

মাঠে নেমেছে আণবিক বোমা হাতে নিয়ে।

'ইটালিতে মূল হেডকোয়ার্টার করেছি আমি। কারণ ব্যাখ্যা করব না। নিউক্লিয়ার বেস্‌কে মূল্যহীন করার কাজে আমি কতটা সফল হয়েছি তা বললাম তোমাকে। এবং বলব এমন একটি যান সম্পর্কে যার সাহায্যে আমি যে ক্ষমতা অর্জন করেছি তা নিখুঁত এবং বাধাহীনভাবে ব্যবহার করা যাবে। ব্রেকফাস্টের পর সেটা দেখাব তোমাকে। ওটার যান্ত্রিক জটিলতা তুমি বুঝবে না। দরকারও নেই বোঝার। গুণ এবং কার্যক্ষমতা দেখালেই তুমি বুঝতে পারবে পৃথিবীর আশ্চর্যতম আবিষ্কার ওটা। এ ব্যাপারেও বন্ধুদের সাহায্য পেয়েছি আমি। আমি একজন বিজ্ঞানী। তাই আর একজন বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব আমাকে গর্বিত করে তোলে। তার নাম না বলে পারছি না। আমার সেই বন্ধুর নাম কারামোভিচ।'

'কারামোভিচ,' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল রানা। 'ভ্লাদিমির কারামোভিচ? কিন্তু তিনি তো আজ পাঁচ বছর আগে সাইবেরিয়ায় নিহত হয়েছেন!'

'হ্যাঁ, শব্দের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি গতিসম্পন্ন এয়ারক্র্যাফট তৈরি করা যায় কিনা পরীক্ষা করার সময় তিনি নিহত হয়েছেন বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। নিজের ডিজাইনে তৈরি করা এয়ারক্র্যাফটে চড়ে আকাশে ওড়েন তিনি। তারপর তাঁর এবং ওই এয়ারক্র্যাফটের খবর বহুদিন পাওয়া যায়নি। কয়েক মাস পর এয়ারক্র্যাফটটা পাওয়া যায় বিধ্বস্ত অবস্থায় সাইবেরিয়ায়। সবাই সন্দেহ করেছিল কারামোভিচের লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে মিশে গেছে ধুলোর সাথে। না, তিনি নিহত হননি। এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না। আমাদের এয়ারক্র্যাফট সম্পর্কে বলবার বিশেষ কিছু নেই আপাতত আজ রাতেই তোমাকে অনেক কিছু দেখাবার আছে। শুধু আভাস দিয়ে রাখি খানিকটা: কল্পনার অতীত গতিসম্পন্ন এই এয়ারক্র্যাফট। কোন শব্দ প্রায় হয় না বললেই চলে। ভিতরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একেবারে নেই। তার মানে এয়ারক্র্যাফটের ভিতর কয়েক টন ওজনের মেশিন থাকলেও তার ওজন থাকবে না।'

'জানি না, সব কথা তোমার সত্যি কিনা,' বলল রানা। 'সত্যি হলে স্বীকার করতে হয় ব্যাপারটা বিরাট কিছু—গোটা ব্যাপারটাই অদ্ভুত। কিন্তু বহু অসুবিধের মুখোমুখি হতে হবে তোমাকে…'

উত্তেজিত হয়ে উঠল কবীর চৌধুরী, 'দেখো, রানা, ইতিমধ্যেই তুমি অর্ধেকটা বিশ্বাস করে ফেলেছ। অসুবিধে অবশ্যই আছে, সেগুলো পরে ভাবব আমরা। সবচেয়ে বড় অসুবিধে,' রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল আবার কবীর চৌধুরী, 'কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে না। এখানেই তোমার সাহায্য চাই আমি। শোনো। ধরো, ব্রিটেনে অবস্থিত আমেরিকান স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ডের একটি প্লেন উড়ছে আকাশে, হাইড্রোজেন বোমা পেটে নিয়ে—ইচ্ছা করে যদি সেই বোমা ফাটিয়ে দিই আমি, তাহলে কাণ্ডটা কি ঘটবে? উত্তরটা আমাকেই দিতে দাও। বর্তমানে যে অকথিত যুদ্ধ চলছে দুই প্রধান ব্লকের মধ্যে তা থেকে বোঝা যায় অমন একটি কাণ্ড ঘটলেই দুই পরাশক্তি পরস্পরকে সন্দেহ করে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। আমি চাই না। যুদ্ধকে চিরতরে

বন্ধ করতে চাই আমি—অথচ তাই ঘটে যাবে।

'ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে তোমার এবং মেজর জেনারেল রাহাত খানকে বোঝাতে হবে যে আমি পাগল নই, এবং আমার হুমকি বাজে কথার বান্ডিল নয়।'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল রানার, নুরেমবার্গের র‍্যালিতে এডলফ্ হিটলারের বক্তৃতা দেবার দৃশ্যের কথা। একটি নিউজফিল্মে দেখেছিল ও বহুদিন আগে। এখনও মনে পড়লেই দৃশ্যটা জ্বলজ্বল করে ভাসে চোখের সামনে। কবীর চৌধুরীর মতই হিটলার দৃঢ়, উন্মত্ত কণ্ঠে, হাত ছুঁড়ে, চোখ ঘুরিয়ে নিজের কথা বলেছিল।

'তোমার সব কথা শুনব আমি, চৌধুরী,' বলল রানা। 'আর আমি যদি উচিত মনে করি তাহলে তোমার দূত হতে আপত্তি করব না। যদিও আমাকে হতে হবে শয়তানের দূত।'

কবীর চৌধুরী কথা বলল না। প্রায় ছুটে একটা ঘরের ভেতর ঢুকে গেল সে।

আট

'ব্রেকফাস্ট তৈরি, স্যার,' একজন উর্দিপরা বেয়ারা এসে জানাল। 'ঈল কাপো আপনাকে অপেক্ষা করতে মানা করেছেন। মিস সোহানা নিজের রুমে ব্রেকফাস্ট করছেন। ঈল কাপো খানিক পরই আপনার সাথে দেখা করবেন।'

হলরুমে বেয়ারার সাথে যোগ দিল একজন বাটলার। পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা লোকটা সশস্ত্র।

দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করার পরপরই কবীর চৌধুরী এল। খানিক আগে খোলা ছাদের কবীর চৌধুরীর সাথে এর কোনও মিল খুঁজে পেল না রানা। প্রকৃতিস্থ হয়ে এসেছে সে। রানার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল কবীর চৌধুরী। সহজ গলায় বলল, 'দুঃখিত, দেরি করে ফেললাম। শুধু এক কাপ কফি পান করব আমি। অপেক্ষা করতে হবে না তোমাকে।'

পাঁচ মিনিটে কাজ শেষ করল সে। 'চলো, দেখা যাক?'

রানাকে সঙ্গে করে হলরুম পেরিয়ে একটা প্যাসেজে এল কবীর চৌধুরী। প্যাসেজটা গিয়ে শেষ হয়েছে বিরাট এক টেনিস খেলার কোর্টের মত প্রশস্ত জায়গায়। আগ্নেয়গিরি জ্বালামুখের অভ্যন্তর ভাগ এই জায়গা। কবীর চৌধুরীকে আর একটা প্যাসেজের শেষ মাথা পর্যন্ত অনুসরণ করল রানা। প্যাসেজের শেষ মাথায় লিফট্টা। কবীর চৌধুরী বোতাম টিপতেই দরজা খুলে গেল। দু'জন সশস্ত্র গার্ড নেমে এল লিফট থেকে। কবীর চৌধুরীকে দেখে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল তারা। তারপর কোন কথা না বলে প্যাসেজ ধরে সোজা চলে গেল। কবীর চৌধুরীর সাথে লিফটে চড়ল রানা।

'আমরা যাচ্ছি আন্ডার গ্রাউন্ড হ্যাঙ্গারে,' কবীর চৌধুরী বলল। 'নিচেরটাই আসলে জ্বালামুখের মেঝে। গ্রাউন্ড লেভেলে যে মেঝে দেখলে সেটা ফল্‌স্‌—যুদ্ধের সময় তৈরি করেছিল জার্মানরা। তখন অবশ্যই কাসা বিলাভিসটা এখানে তৈরি হয়নি।'

লিফট থেকে নেমে এল ওরা চওড়া একটা প্যাসেজে। দেয়ালগুলো চুনকাম করা। মেঝেটা খানিক ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে।

'স্লাইডিং রুফটাও বুঝি জার্মানরা তৈরি করেছিল?' রানা প্রশ্ন করল। বাশারের সংগৃহীত তথ্যটা যাচাই করতে চায় ও।

'ওটার কথাও জানো তুমি?'

হ্যাঁ, না কিছুই বলল না রানা।

'না, হেডকোয়ার্টার হিসেবে এটাকে যখন ব্যবহার করার পরিকল্পনা করি তখন আমিই তৈরি করেছিলাম ওটা। করেছি বহু কিছুই। কাসা বিলাভিসটার প্রধান বিল্ডিঙের উপর, পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো গোপন প্রবেশ পথ ছিল। সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি সবগুলো।'

প্যাসেজের শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। মোটা স্টীলের দরজা পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলল কবীর চৌধুরী। প্রকাণ্ড এক গুহার ভিতর ঢুকল ওরা। পাথরের দেয়াল ঘষে ঘষে মসৃণ করে চুনকাম করা হয়েছে। গুহাটার আয়তন অন্তত দুশো গজ, প্রায় গোলাকার। জায়গাটা গোলাপী আলোয় আলোকিত। মেঝে এবং দেয়ালের খানিকটা অংশে আলোর বন্যা, ছাদ এবং দেয়ালের উপরকার অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

'আগ্নেয়গিরির আসল মেঝেতে দাঁড়িয়ে রয়েছি এখন আমরা,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ওই যে ওটা দেখাতে এনেছি তোমাকে।' আঙুল বাড়িয়ে গুহার মাঝখানটা দেখাল সে।

রানা যত বড় আশা করেছিল এয়ারক্র্যাফটটা তার চেয়ে ছোট। ওর দেখা কোনও এয়ারক্র্যাফটের সাথে বিন্দুমাত্র মিল নেই এটার। ওটার দিকে এগোতে এগোতে কবীর চৌধুরী বলল, 'দু'এক মিনিটে ওটা দেখে ওয়র্কশপে যাব আমরা। কিছু দেখাবার আছে তোমাকে।'

এয়ারক্র্যাফটের গোলাকার বেড় পেরিয়ে রানা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল উপরের ও নিচের প্লেট দুটো। উপর নিচের অংশ ঠিক প্লেটের মতই দেখতে। নিচের প্লেটটা ত্রিশ ফিট ডায়ামিটারের হবে। সেটা গোলাকার স্তম্ভমূলে বসানো। স্তম্ভটা তিন ফিটের মত উঁচু, স্টীলের থাম দিয়ে তৈরি করা। একটা গর্তের ভিতর থেকে উঠে এসেছে স্তম্ভটা। কবীর চৌধুরীর পিছন পিছন সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ বেয়ে নিচে নামল রানা। আকাশযানটার পেটের কাছে এসে দাঁড়াল ও। এয়ারক্র্যাফটের কোমর ক্রমে সরু হয়ে আবার মোটা হতে হতে উপরের প্লেটের সাথে মিশেছে। হাত দিয়ে স্পর্শ করল রানা এয়ারক্র্যাফটটার গা। মসৃণ। লক্ষ করল আলো পড়ার ফলে গা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে না।

বিপরীত দিকের সিঁড়ি বেয়ে গর্ত থেকে উপরে উঠে এল ওরা। দেয়ালের গায়ে বসানো একটা স্টীলের দরজা খুলে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা হলের ভিতর ঢুকল কবীর চৌধুরী। অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকে রানা দেখল জায়গাটা ভারী মেশিনে ঠাসা। দু'জন লোক কাজ করছে একটা বেঞ্চে।

'ইমার্জেন্সি কাজের জন্যে এই ওয়র্কশপ। ছোটখাট মেরামত চলে এখানে। তাছাড়া বাকি সবই করা হয় ইটালির নর্থে,' বলল কবীর চৌধুরী।

মেশিনগুলো দেখছিল রানা। কবীর চৌধুরী একজন মেকানিককে ডেকে অনর্গল জার্মান ভাষায় কিছু নির্দেশ দিল। লোকটা তখুনি একজোড়া গ্যাস সিলিন্ডারের ভাল্‌ভ অ্যাডজাস্ট করতে শুরু করল। দ্বিতীয় লোকটি এক টুকরো ধাতব পদার্থ নিয়ে চলে গেল হলের শেষ প্রান্তে। দেয়ালের গায়ে সেটাকে ঝুলিয়ে রেখে ফিরে এল সে। এয়ারক্র্যাফটটার বহিরাবরণ এই ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি তা লক্ষ্য করতে ভুল হয়নি রানার।

দ্বিতীয় লোকটি আর এক টুকরো ধাতব বস্তু রাখল মেঝের উপর। প্রথম লোকটা গ্যাস সিলিন্ডারের যুক্ত পাইপের মুখটা ওটার কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে বোতাম টিপল। নীলচে একটুকরো চোখ ধাঁধানো আলো লাফিয়ে বেরিয়ে এল পাইপের মুখ থেকে।

স্টীল হলে কয়েক সেকেন্ডে গলে যেত ধাতব বস্তুর অংশটি। কিন্তু এটিতে কোন ক্রিয়া করল না। হাসতে হাসতে কবীর চৌধুরী জিনিসটার উপর আঙুল রাখল। আঙুলটা সে আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে গেল ঠিক যে জায়গায় নীলচে তীব্র আগুন পড়ছে তার আধ ইঞ্চির মধ্যে। 'তুমি নিজে দেখো,' হাসিমুখেই বলল সে রানাকে।

রানা ধাতব বস্তুটি মেঝে থেকে এক হাতে তুলে নিয়ে যেখানটায় নীল আগুন পড়েছে তার বিপরীত দিকে আঙুল রাখল। এয়ারক্র্যাফটের গায়ে হাত দেবার সময় যা অনুভূত হয়েছিল এখনও তাই হলো। বিন্দুমাত্র উত্তাপ নেই।

'কাজের জিনিস, নয় কি?' কবীর চৌধুরী বলতে শুরু করল বক্তৃতার ভঙ্গিতে, 'এই জিনিস দিয়ে তৈরি আমার আকাশযান। যে কোন হিট সহ্য করবার ক্ষমতা আছে এর। এবার দুটো কথা বলব হাইড্রোজেন বোমা সম্পর্কে। তুমিও জানো যে এই বোমা একটি কনটেনারে রাখা মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য বস্তু ছাড়া আর কিছুই না এবং প্রচুর শক্তিসম্পন্ন উত্তাপ নিয়োগ করার পর সেটা ফাটে, আর ফাটলে উৎসারিত হয় ভয়ঙ্কর পরিমাণ এনার্জি গ্যাস, প্রধানত হিলিয়াম। সূর্যে যা প্রতি মুহূর্তে ঘটছে তাই ঘটে, একই পদ্ধতিতে। প্রতিটি হাইড্রোজেন বোমার চাবিকাঠি হচ্ছে ক্ষুদ্র একটি অ্যাটোমিক ডিটোনেটর। প্র্যাকটিসের সময় এই ডিটোনেটর মিসাইল বা বোমায় সংযুক্ত করা হয় না। সব সময়ই বোমা এবং ডিটোনেটর আলাদা আলাদা গুদামে রাখা হয়। এমন কি এয়ারক্র্যাফটে করে নিয়ে যাবার সময়ও বোমার ভেতর ঢোকানো হয় না ডিটোনেটর। ব্যবহার করার পূর্ব মুহূর্তেই শুধু তা করা হয়। আলাদা কম্পার্টমেন্টে থাকে ওগুলো। আমি যা বলতে চাইছি তা হলো প্রতিটি হাইড্রোজেন বোমা ফাটে শুধু মাত্র অ্যাটোমিক ডিটোনেটরের প্রচণ্ড উত্তাপ

পেয়ে। আমার বিজ্ঞানীরা এমন একটি যন্ত্র এবং পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে পনেরো মাইল দূরের হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে দেবার মত যথেষ্ট পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি হতে পারে। দুটো প্রশ্নের সমাধানে পৌঁছুতে হবে এবার। কোথায়, ঠিক কোন্ জায়গায় বোমাগুলো আছে তা জানা। ইতিমধ্যেই একটা তালিকা আমরা করে ফেলেছি। দ্বিতীয় প্রশ্নটাও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এমন একটি ট্র্যান্সপোর্ট চাই যেটা কোন জায়গায় বোমা ফাটাবার পর পরই দ্রুত সেই জায়গা থেকে দূরে সরে যেতে পারে শক-ওয়েভের হাত থেকে বেঁচে। এয়ারক্র্যাফটটা সমাধান করেছে এই সমস্যা। এটা সম্পূর্ণ হিট-প্রুফ। এবার কি রকম ভাবে বোমা ফাটাতে পারব আমরা তার একটা ক্ষুদ্র নমুনা দেখো— এটা দেখে অনেকটা অনুমান করতে পারবে।' কবীর চৌধুরী সিনেক্যামেরার মত দেখতে একটা বাক্সের মুখ ঘুরিয়ে ধরল দূরের দেয়ালের দিকে। যেদিকে খানিক আগে একজন মেকানিক রেখে এসেছে এক টুকরো ধাতব বস্তু।

মুহূর্তের জন্যে বাক্সের গায়ের একটা বোতাম স্পর্শ করেই ছেড়ে দিল কবীর চৌধুরী। চোখের পলকে রানার চোখের সামনে থেকে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল দেয়ালের গায়ে ঝোলানো ধাতব বস্তুটা।

হাসছিল কবীর চৌধুরী, রানা তার দিকে তাকাতে বলল, 'ব্যাপারটা ঘটল এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে। এয়ারক্র্যাফটের ভিতর প্রকাণ্ড যে মেশিনটি আছে সেটির বোতাম যদি কয়েক সেকেন্ড টিপে রাখি তাহলে উত্তাপ, এমন কি পনেরো মাইল দূর থেকেও, কয়েক হাজার গুণ বেশি হবে। সবসময় আমরা সফল হব, বলছি না। তার দরকারও নেই। ধরো, একটি বোমাও যদি আমার পদ্ধতিতে ফাটিয়ে দিই তাহলে কি হুলস্থূল কাণ্ডই না ঘটে যাবে। কিন্তু আমি তা চাই না। যদি করি তাহলে মানব জাতিকে যে আতঙ্ক থেকে বাঁচাতে আমি বদ্ধপরিকর সে আতঙ্কেই টেনে আনব নির্মম ভাবে। আমি তা চাই না। কিন্তু চাই পৃথিবীর মানুষ, বিশেষ করে দুটি প্রধান পাওয়ার-ব্লক জানুক আমার কথা, আমার ক্ষমতার কথা, আমার হুমকির কথা।'

রানা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কবীর চৌধুরী থামিয়ে দিল ওকে।

'চলো এবার আমার স্টাডিরুমে গিয়ে প্ল্যান-প্রোগ্রাম সম্পর্কে কথা বলি।'

কুড়ি মিনিট ধরে রানার মুখোমুখি বসে নিজের প্ল্যানটা প্রকাশ করল কবীর চৌধুরী। প্রস্তাব দিল রানা লন্ডনে ফিরে গিয়ে সব ঘটনা মেজর জেনারেল রাহাত খানকে খুলে বলুক এবং মেজর জেনারেল রাহাত খান ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ও সেখানে অবস্থিত পৃথিবীর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশের এমব্যাসিকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করুক।

রানাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই দ্রুত স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল কবীর চৌধুরী তার কথা শেষ করে।

'তুমি রাজি হয়ে গেলে, রানা?'

কথা বলল না রানা। খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে দূরে চন্দ্রালোকিত উপত্যকার

দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও।

'সব দেখে আমি ভয় পেয়েছি,' বলল রানা খানিক পর।

'সব কথা তুমি বসকে বলার পর তিনি ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার এবং অন্যান্যদের বোঝাবেন। তাদের কাছ থেকে কি আশা করো তুমি?'

রানা বলল, 'তারা কে কি বলবে জানি না। আমার দায়িত্ব তাদেরকে খবরটা জানানো।'

সোহানা চেয়ার ছেড়ে রানার পাশে এসে দাঁড়াল, 'তাঁরা যদি শয়তানটার প্রস্তাব মেনে নিতে না চান?'

'কবীর চৌধুরী যে-কোন জায়গায় একটি হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে দেবে,' রানা এক মুহূর্ত পর আবার বলল, 'আমাকে ওর আর তখন দরকার হবে না। প্রতিশোধ নেবে আমাকে খুন করে। আজীবনের শত্রুকে সে সরিয়ে ফেলবে চিরতরে।'

'আর আমি? আমার কি হবে?'

'তোমাকেও শেষ করবে ও—তবে আমাকে শেষ করার পর।'

'তাহলে উপায়?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সোহানা।

জোর করে হাসল রানা, 'উপায় একটা হবেই। চিন্তা কোরো না। আমি যাচ্ছি, ফিরেও আসব। কবীর চৌধুরী চাইলেও আসব, না চাইলেও আসব।'

'কিন্তু তুমি ফিরে আসলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে?'

'সমাধান?' রানা অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'হ্যাঁ, সমাধান একটা হতে তো হবেই। একটা কথা, আমি না ফেরা অবধি কিছু করতে যেয়ো না তুমি। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো।'

সোহানা একটা হাত রাখল রানার কাঁধে, 'ভেবে দেখো, রানা। এই জায়গা দুর্ভেদ্য দুর্গের মত। একবার বেরিয়ে গেলে আবার ঢোকার সুযোগ তুমি নাও পেতে পারো। আমরা দু'জন মিলে এখুনি কিছু একটা করতে পারি না? মোট দুশো সশস্ত্র লোক আছে কবীর চৌধুরীর, ওদের মুখোমুখি হওয়াটা বোকামি। বরং চৌধুরীকে হঠাৎ আক্রমণ করে মেরে ফেললে বারো আনা কাজ শেষ হয়ে যায়। লীডার নিহত হবার পর ওদের মনোবল ভেঙে যাবে। সেই সুযোগে...'

'দুর্বলচেতা লোকদের নিয়ে কাজ করে না কবীর চৌধুরী। তাছাড়া প্রতিটি সেকেন্ডে গোপন টি. ভি-তে আমাদের চলন-বলনের ওপর নজর রাখা হয়েছে। আক্রমণ করার আগেই ধরা পড়ে যাব।' রানা একটু থেমে বলল, 'তাছাড়া এয়ারক্র্যাফটের ভিতর মেশিন বসানো আছে। সে-মেশিনের কলকজা কিছুই জানা নেই আমার। কবীর চৌধুরীর সহকারীদের কেউ না কেউ অবশ্যই জানে। সে যদি ইচ্ছে করে ফেটে যাবে কোথাও না কোথাও হাইড্রোজেন বোমা। না, এতবড় রিস্ক আমি নিতে পারব না, সোহানা। বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবে।' ঘড়ি দেখল ও। রাত দশটা বাজতে তিন মিনিট, 'আমার যাবার সময় হয়েছে, সোহানা। যা বললাম মনে রেখো। আমি না ফেরা অবধি অপেক্ষা কোরো। আর বিশ্বাস রেখো—আমি আসবই।'

পাশ থেকে সরে গিয়ে রানার মুখোমুখি দাঁড়াল সোহানা। চাঁদের আলোয় ম্লান দেখাল ওর মুখটা। রানার দুই কাঁধে হাত দিয়ে মুখ তুলে দাঁড়াল ও, 'মরতে আমি ভয় পাই না, রানা। তুমি ফিরে না এলে আমি দুঃখ করব না। এই অ্যাসাইনমেন্টেই তুমি দু'দুবার বাচিয়েছ আমাকে। তুমি মহৎ, রানা। বারবার তুমি বাঁচাবে আমাকে সে-ভাগ্য হয়তো করে আসিনি...' ওর চোখের জমিতে চিকচিক করে উঠল পানি।

রানা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সোহানাকে। আস্তে আস্তে মাথা নামিয়ে চুমু খেলো ওর ঠোঁটে। মুখ তুলে নিয়ে তাকাল ও। চোখ বন্ধ করে মুখ তুলে রেখেছে সোহানা। আবার মাথা নুইয়ে চুমু খেলো রানা। অনেকক্ষণ।

'এই শুরু, কিন্তু এই শেষ নয়,' ফিসফিস করে বলল রানা সোহানাকে ছেড়ে দিয়ে, 'আমি ফিরে আসব।'

এক তালে পা ফেলে খোলা ছাদে এসে হাজির হলো দু'জন লোক। কয়েক কদম দূর থেকেই একজন বলল, 'মি. রানা, ঈল কাপো আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা। লোক দু'জনের পিছু পিছু যাবার সময় একবারও পিছন ফিরে তাকাল না ও। সোহানা ওর গমন পথের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল চাঁদের আলোয়, একা।

রানা দেখল জি-স্যুট, অক্সিজেন মাস্ক, প্যারাস্যুট, টেমপারেচার কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট, কিছুরই দরকার নেই। অথচ জটিল ফ্লাইটে এসবের দরকার হয়। এয়ারক্র্যাফটের ভিতরটায় উজ্জ্বল আলো। ভিতরের আঙটির মত খোলটার মধ্যে একটা গদিমোড়া চেয়ারে অপেক্ষা করছিল কবীর চৌধুরী, তার সামনে পর পর সাজানো চারটে টিভি পর্দা। একটি টিভি সেট চালু। পর্দায় দেখা যাচ্ছে কয়েকজন লোককে। তাদের মধ্যে ফ্যালকনকে দেখা যাচ্ছে। ইটালিয়ান, জার্মান, রাশান, ইংরেজ, চীনা—সব জাতেরই লোক রয়েছে দলটির মধ্যে। কবীর চৌধুরী একটা মাউথপিস মুখের সামনে ধরে নির্দেশ দিচ্ছে তাদেরকে, 'মিস সোহানাকে আগের মতই যত্নে রাখবে তোমরা। ও কোনও গোলমাল করবে বলে মনে হয় না। যদি একান্তই করে তাহলে বিপদ পুষে রাখবার দরকার নেই।' সোহানাকে হত্যা করবার নির্দেশও দিয়ে রাখল কবীর চৌধুরী, 'মেজর মাসুদ রানা লন্ডন থেকে টেলিফোন করে জানাবে তোমাদেরকে কখন সে পৌঁছুবে সিয়ামপেনো এয়ারপোর্টে। একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো ওর জন্যে। আগামীকাল রাত ঠিক এগারোটায় ফিরে আসব আমি। আগামীকাল লাঞ্চ সারব আমি অস্ট্রেলিয়ায়। বিপদসূচক কিছু ঘটতে যাচ্ছে সন্দেহ করলে বারলেটায় টেলিফোন করবে মানাটোফকে। সে যোগাযোগ করবে আমার সাথে। গুড নাইট, মাই বয়েজ।'

রানার দিকে ফিরে হাসল কবীর চৌধুরী, 'তৈরি তুমি?'

রানা মাথা নাড়তে সুইচ-বোর্ডের একটা বোতাম টিপল সে, মুখে বলল, 'প্রিপেয়ারিং টু টেক অফ। জিরো গ্র্যাভিটি।'

মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল ইঞ্জিনের।

'আমাদের নিজস্ব গ্র্যাভিটিতে প্রতিষ্ঠিত হলাম আমরা,' ব্যাখ্যা করল কবীর চৌধুরী, 'এয়ারক্র্যাফট এবং এয়ারক্র্যাফটের ভিতর যা কিছু আছে—সব ওজনহীন এখন। কোনও মুভমেন্ট অনুভব করতে পারছ কি? পারবে না, অথচ এয়ারক্র্যাফটের মাঝখানটা, নিচের এবং উপরের প্লেট দুটো ছাড়া ঘুরতে শুরু করেছে। পৃথিবী যে গতিতে ঘুরছে নিজ মেরুদণ্ডের ওপর সেই গতিতে ঘুরছে এয়ারক্র্যাফটের মাঝখানটা।'

মাথার উপর থেকে স্লাইডিং রুফ সরে গেল ধীরে ধীরে, টিভির পর্দায় দেখতে পেল রানা।

সুইচ-বোর্ডের পাশে পরপর অনেকগুলো হাতল। রানা লক্ষ করল সুইচ-বোর্ডের বোতাম বা হাতলগুলোর নিচে কিছু লেখা নেই। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে কবীর চৌধুরী বলল, 'লিখিনি কিছু। আমি ছাড়া আর কেউ এই এয়ারক্র্যাফট অপারেট করতে পারবে না। হাতল আর সুইচগুলোর মধ্যেই আছে এয়ারক্র্যাফটের ধ্বংস। নির্দিষ্ট একটা হাতল বা একটা বোতাম টিপলেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে সব। আনাড়ি কেউ এট্যাকে চালাতে গেলে আর রক্ষা নেই।'

একমুহূর্ত পর কবীর চৌধুরী একটা হাতল ধরে টানল, খটাস্ করে শব্দ হলো একটা। কবীর চৌধুরী জানাল, 'নেগেটিভ গ্র্যাভিটি-ওয়ান।' ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল সে তারপর, 'গতি বাড়াচ্ছি আমি। নেগেটিভ টেনে পৌছে সোজা ওপর দিকে সেকেন্ডে বত্রিশ ফিট উঠতে পারি আমরা। ইচ্ছা করলেই হাজার গুণ বাড়বে এই বেগ।' পর পর কয়েকটা বোতামে চাপ দিল সে, 'নেগেটিভ—টু—থ্রী—ফোর—ফাইভ—সিক্স। চেক।'

এক মুহূর্ত স্পীড মিটারের কাঁটার দিকে তাকিয়ে থেকে কবীর চৌধুরী বলল, 'নেগেটিভ সিক্স সেট।'

মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি ছাড়া কোথাও আর কোনও শব্দ নেই। বিন্দুমাত্র বদলায়নি টেম্পারেচার, লক্ষ্য করল রানা। অল্টিমিটারের দিকে তাকাল ও। তীর চিহ্নটা, দু'হাজার নম্বরে গিয়ে ঠেকেছে।

'এখন,' কবীর চৌধুরী বলল, 'মাটি থেকে আমরা পনেরো মাইল উপরে।' বোতাম টিপল সে দুটো। 'ওপরে উঠছি না আর, সোজা এগোচ্ছি। সব কিছুর ওজন এখন মাইনাস টোয়েন্টি পাউন্ডস্। আঠারো টন ওজন ছিল সর্বমোট।'

চারটে টি. ভি. সেটের তিনটিই অন্ করা।

ইউরোপের উপর দিয়ে যাবার সময় কোন ঘটনাই ঘটল না।

'দেখো রানা, প্যারিস।' টিভির একটা পর্দার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল কবীর চৌধুরী, 'সাসেক্স পৌছে যাব এখুনি আমরা।' বোতাম টিপে ডায়ালের দিকে চোখ রাখল সে। এয়ারক্র্যাফট নামতে শুরু করল কয়েক মুহূর্ত পরই।

'বীচি হেড-এর একটা পার্কে নামছি আমরা। পার্কের মেন গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবে তুমি। ওখানে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। লন্ডন

পৌঁছে দেবে শোফার তোমাকে।' হঠাৎ গলার স্বর পরিবর্তন করল সে, 'আগামীকাল রাত বারোটার মধ্যে তোমার মুখ থেকে সব শুনতে চাই আমি, রানা। তার আগেই লুসেরায় পৌঁছুতে হবে তোমাকে। আমার প্রস্তাবটা আর একবার শোনো: আমাকে থার্ড ব্লক হিসেবে স্বীকার করে নিলে আগামী মাসের কোন এক তারিখে আমার প্রতিনিধিদের সাথে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গকে বৈঠকে বসতে হবে। মধ্যবর্তী সময়ে আণবিক বোমার পরীক্ষা করা চলবে না— সমুদ্রের নিচে বা মাটির নিচে, কোথাও না। আর যে সব গুদামে নিউক্লিয়ার বোমা আছে তা সরিয়ে অন্যত্র রাখার চেষ্টা করাও চলবে না। চেষ্টা করা হলে আমি তা সাথে সাথে জানতে পারব। সেক্ষেত্রে আমার অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হব আমি। আমি জানি,' কবীর চৌধুরী ক্রূর হাসি হাসল, 'আমার সব শর্তই মেনে নিতে হবে ওদেরকে। তাছাড়া আমাকে ঠেকাবার কোনও উপায় নেই। আমার প্রথম প্রস্তাব স্বীকার করে নিলে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আমি জানাব আমার পরবর্তী কর্মপন্থা।'

'তোমার পরবর্তী কর্মপন্থাটা কি হবে?' রানা শান্ত ভাবে জানতে চাইল।

'সেটা যাই হোক, শেষ পর্যন্ত গোটা দুনিয়াকে আমরা ক্ষমতার ভিতর টেনে আনবই আমি। সেটা ধীরে ধীরে আমি পারব, তুমি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। আমার হাতে যে কী ভীষণ অস্ত্র আছে তা তো তুমি দেখেইছ। তোমার কি মনে হয়? পারব না আমি এই অস্ত্র দিয়ে পৃথিবী শাসন করতে?'

'জানি না,' মৃদু স্বরে বলল রানা। 'তবে পারা উচিত।'

হা হা করে গলা ছেড়ে হাসল কবীর চৌধুরী। 'তুমি স্বীকার না করে পারবে না, আমি জানতাম। ধন্যবাদ। আমরা নেমে গেছি, রানা।'

কোনও ধাক্কা, কোনও ঝাঁকানি কিছুই টের পায়নি রানা। টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে পার্কটা। দরজা খুলে দিল কবীর চৌধুরী, 'গুড লাক, রানা। আশা করি ওদেরকে বোঝাতে পারবে তুমি। বুঝতেই তো পারছ ওরা যদি আমার ক্ষমতাকে স্বীকার করে না নেয় তাহলে গোটা মানবজাতিকে ধ্বংস করে দেবার আশঙ্কা সৃষ্টি করব আমি প্রথমে একটি হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে দিয়ে। আগামীকাল রাত বারোটার মধ্যে তোমার মুখ থেকে কোনও কথা না পেলে বড়জোর একঘণ্টা অপেক্ষা করব আমি। তারপর ব্যবহার করব চরম অস্ত্র। পৃথিবীর সমস্ত বোমা ফাটিয়ে দেব প্রয়োজন হলে। আশা করি উত্তর নিয়ে তার আগেই পৌঁছে যাবে তুমি। গুড লাক টু ইউ, রানা। ডু ইওর বেস্ট।'

লাফিয়ে ঘাসের উপর নামল রানা। দরজা বন্ধ করে দিল কবীর চৌধুরী ভিতর থেকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে মেন গেটটা কোন্ দিকে দেখার চেষ্টা করল রানা। তারপর তাকাল এয়ারক্র্যাফটটার দিকে।

ওটার কোনও চিহ্ন নেই মাটিতে বা আকাশে। অদূরেই একা ভেড়া ব্যা ব্যা করছে। আর কোথাও কোনও শব্দ নেই।

পার্ক থেকে বেরিয়ে এল যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায়। বড় একটা অস্টিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় গাড়ির দরজাটা খুলে গেল। একজন ইংরেজ শোফার

বেরিয়ে এল ভিতর থেকে, 'মেজর রানা, স্যার?'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। পিছনের দরজা খুলে ধরল শোফার। গম্ভীর মুখে ভিতরে ঢুকল রানা।

পথে কোনও কথাবার্তা বলল না ও। রাতের অপেক্ষাকৃত নির্জন হাইওয়ে। পঁচাত্তর মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে লন্ডনের পিকাডেলিতে রানাকে নিয়ে পৌঁছে গেল শোফার রাত সাড়ে এগারোটায়। পিছনের দরজা খুলে দিয়ে টুপি ছুঁয়ে সম্মান দেখাল ব্যাটা। রানা ধীরে সুস্থে নামল গাড়ি থেকে।

'আপনার আর কোনও কাজে লাগব আমি, স্যার?'

রানা দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শোফারের দিকে, 'ধন্যবাদ। তোমার কাজ শেষ করছ তুমি।' এমব্যাসির গেটের দিকে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে পিছনে গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ শুনতে পেল রানা।

গেট খুলে দিয়ে সালাম দিল দারোয়ান। লন পেরিয়ে করিডরে উঠল ও। ডেস্ক-ক্লার্কের দিকে না তাকিয়ে জুতোর শব্দ তুলে রিসেপশন লেখা রুমটার পাশ ঘেঁষে সোজা লিফটের দিকে এগোল রানা। দ্রুত শব্দ শোনা গেল হাইহিলের। রিসেপশনিস্ট যুবতীটি রুম থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়াল। রানা ঢুকে পড়ল লিফটের ভিতর। ডেস্ক-ক্লার্ক বলে উঠল যুবতীটিকে লক্ষ্য করে, 'মেজর মাসুদ রানা। অন্য কেউ নয়।'

সেকেন্ড ফ্লোরে থার্ড সেক্রেটারির দেখা পেল ও। রানা গম্ভীর গলায় জানতে চাইল, 'বস্ ওপরে আছেন?'

'না। ইটালিয়ান এমব্যাসিতে গেছেন। খবর পাঠাব?'

'এখুনি।' রানা দ্রুত চিন্তা করে বলল, 'আমাকে পৌঁছে দিন ওঁর চেম্বারে। ফোনে আমি কথা বলব ওঁর সাথে।'

'ফোন তুলে আমার গলা শুনেই ধমকে উঠবেন।' থার্ড সেক্রেটারি একটু হাসল, 'ডিস্টার্ব করতে মানা করে গেছেন। আপনার কথা আলাদা...'

ইটালিয়ান এমব্যাসিতে কেন রাহাত খান? প্রশ্নটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে চারতলার সেই নির্দিষ্ট চেম্বারে পৌঁছুল রানা। নাম্বারটা বলে দিয়ে থার্ড সেক্রেটারি বেরিয়ে যেতেই ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা।

'হ্যালো,' ইংরেজীতে অ-ইংরেজ একটি মেয়ে অপরপ্রান্ত থেকে বলল, 'এটা ইটালি সরকারের লন্ডনস্থ দূতাবাস।'

'মেজর জেনারেল রাহাত খান আছেন আপনাদের দূতাবাসে। ওঁকে বলুন মাসুদ রানা—এমব্যাসি থেকে বলছি।'

দু'মিনিট চুপচাপ কাটল। তারপর সেই ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'কখন ফিরলে, রানা? খবর দিয়ে ফিরতে পারলে না?'

'এখুনি ফিরেছি, স্যার। খবর দেয়া সম্ভব হয়নি। আড়াই ঘণ্টা আগে ইটালিতেই ছিলাম আমি, স্যার।'

'কি বললে?' বিরক্ত কণ্ঠস্বর রাহাত খানের। রানা অনুমান করল ভিতরে ভিতরে চমকে গেছে বুড়ো। পাঁচ ঘণ্টার কমে ইটালি থেকে লন্ডনে ফেরা

আধুনিকতম প্যাসেঞ্জার প্লেনের পক্ষেও অসম্ভব।

'আপনার সাথে জরুরী কথা আছে, স্যার। এখুনি একবার আসতে হয়।'

উত্তর শুনে মনে হলো রানার ডাঁট দেখাচ্ছে বুড়ো। বললেন, 'জরুরী মীটিং চলছে এখানে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করো তুমি। তোমার অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কেই নতুন সব তথ্য পাওয়া গেছে। মীটিংটা শেষ করেই ফিরছি আমি।'

'না, স্যার।' রাহাত খান রিসিভার নামিয়ে রাখার আগেই বলল রানা, 'ওসব মীটিং করে কোন ফল হবে না। আপনি সব শুনলে বুঝতে পারবেন।'

'ওহ!' রাহাত খান থমকে গেলেন কথা শুনে। 'অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছ ব্যাপারটার ওপর।'

'সত্যি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, স্যার। এখুনি চলে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি এখানেই।'

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা, তারপর বললেন মেজর জেনারেল, 'ঠিক আছে। আমি আসছি।' রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনল রানা।

ঘণ্টাগুলো একে একে কেটে গেল তীব্র ঝড় তুলে। জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কাটাল রানা বন্ধ চেম্বারে মেজর জেনারেল রাহাত খানের সাথে। ডজন ডজন প্রশ্নের উত্তর আর সেগুলোর ব্যাখ্যা দিতে হলো ওকে। রাত দুটোর সময় এমব্যাসি থেকে বেরিয়ে সোজা নিকটস্থ বারে গিয়ে বসল রানা। মেজর জেনারেল রাহাত খান অত রাতে এমব্যাসি থেকে বেরিয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র দফতরের প্রধান অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে ফোন পেয়ে আগেই জমায়েত হয়েছে ইটালি, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া ও ফ্রান্সের অ্যামবাসাডররা। আরও আছেন ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সেক্রেটারি ও প্রধান মন্ত্রী।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে ওদের বৈঠক চলল ভোর সাড়ে পাঁচটা অবধি।

বারে বসে রানা কল্পনা করার চেষ্টা করল রাহাত খান বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিনিধিদের কতটা বোঝাতে সক্ষম হবেন। ও লন্ডনে পৌঁছুবার আগেই ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস মানাটোফ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছিল ইটালিয়ান দূতাবাসের সহযোগিতায়। ইটালি সরকার বহুদিন ধরেই মানাটোফের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের সাথে প্রায় দেখা-সাক্ষাৎ করত এই তথ্য পেয়ে ইন্টারপোলের এজেন্টরা বাছা বাছা ক'জন লন্ডননিবাসী বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাঁদের মধ্যে দু'জন স্বীকার করেছে যে মানাটোফ মোটা টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা কিনেছে। বিজ্ঞানী দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা যে ধরনের তথ্য ও ফর্মূলা বিক্রি করেছে মানাটোফের কাছে তা দেশের নিরাপত্তার জন্যে বিপজ্জনক। তারপরই লন্ডনস্থ ইটালিয়ান দূতাবাসে ফরেন অফিসারদের এক বৈঠক ডাকা হয়। রানা যখন লন্ডন পৌঁছেছে মেজর জেনারেল রাহাত খান তখন সেই বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন।

বার থেকে বেরিয়ে রাত সাড়ে তিনটেয় এমব্যাসিতে ফিরে এল রানা।

থার্ড সেক্রেটারি অপেক্ষা করছিলেন ওর জন্যে, 'আপনার জন্যে রুম তৈরি, মি. রানা। বিশ্রাম নিন আপাতত। মেজর জেনারেল ফিরে আপনাকে কল করলে খবর দেব আমি।'

কথা না বলে ওর জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। পোশাক ছেড়ে নরম গদিওয়ালা বিছানায় শুয়ে পড়ল ও।

ঘুম এসে দুই চোখ দখল করে নেবার আগে ওর মানসপট থেকে সোহানার চন্দ্রালোকিত মুখটা আবছা হয়ে মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

সাড়ে পাঁচটার সময় থার্ড সেক্রেটারি ঠক্ ঠক্ করে দরজায় টোকা মারতেই রানা চোখ মেলে তাকাল। 'কাম ইন।'

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন থার্ড সেক্রেটারি, 'মেজর জেনারেল আশা করছেন আপনাকে আধঘণ্টার মধ্যে। বাথরুমে সব তৈরি আপনার, ফিরলেই ব্রেকফাস্ট দিয়ে যাবে বেয়ারা।'

'ধন্যবাদ।' রানা মুচকি হাসল, 'বুড়োর মেজাজ কেমন মনে হলো দেখে?'

'ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, কিন্তু পাইপ টানছেন ঘনঘন চেম্বারে বসে, দেখে এলাম।' থার্ড সেক্রেটারি চিন্তান্বিত।

'সেরেছে তাহলে।' বিছানায় উঠে বসল রানা। থার্ড সেক্রেটারি বেরিয়ে গেলেন।

বাথরুম থেকে শাওয়ার সেরে বেডরুমে ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট সারল রানা ধীরেসুস্থে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল ও। তিন মিনিট বাকি আধঘণ্টার। কি বলবে বুড়ো? 'রানা, ওরা কেউ রাজি হয়নি কবীর চৌধুরীর প্রস্তাবে, এখন কি করতে চাও তুমি?' এ কথার উত্তরে কি বলবে ও?

সিগারেট শেষ করে রুম থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল রানা। রাহাত খানের চেম্বারের দরজার সামনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল ও। পনেরো সেকেন্ড নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মনটাকে সবরকম পরিস্থিতির জন্যে তৈরি করে নিল। তারপর দরজা ঠেলে ঢুকল ভিতরে।

রাহাত খান পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে জানালা পথে তাকিয়ে আছেন বাইরের রাস্তার দিকে। মাথার উপর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, দাঁতে চাপা জ্বলন্ত পাইপ।

'বোসো, রানা,' একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে ভারী গলায় বললেন রাহাত খান।

রানা নিঃশব্দে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল না কিছুক্ষণ।

তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন রাহাত খান। রানার দিকে তাকালেন। দুই চোখ যেন অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে রানার। ধীরে ধীরে ডেস্কের ওধারে নিজের চেয়ারটায় বসলেন। 'ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তোমার সাথে কথা বলবেন, রানা,' বললেন তিনি। 'সময়টা এখনও ঠিক হয়নি। তিনি বিদেশী প্রতিনিধিদের সাথে আবার মিলিত হচ্ছেন আধঘণ্টার মধ্যে। আমিও থাকব। কিন্তু ফাইন্যাল কথা তোমার সাথেই বলবেন। তুমি তৈরি থেকো।'

দ্রুত চিন্তা করছিল রানা। চীফ অসন্তুষ্ট বোধ করছেন, বুঝতে বাকি রইল না ওর। আলোচনায় নিরাশ হয়েছে বুড়ো—তারমানে ওরা কি কেউ কবীর চৌধুরীর প্রস্তাব স্বীকার করতে সম্মত হয়নি? নাকি ওরা স্বীকার করে নেবার পক্ষে কথা বলেছে বলেই অসন্তুষ্ট হয়েছেন বস্ ?

'ওদের সাথে আলোচনার ফল কি হলো, স্যার?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল রানা।

ওর দিকে তাকালেন রাহাত খান, থমথমে হয়ে উঠেছে মুখের চেহারা, 'আলোচনা এখনও চলছে। সময়মত সব জানতে পারবে তুমি। এমব্যাসি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। যখন-তখন দরকার হতে পারে তোমাকে। যাও, বিশ্রাম নাও গে।'

বোকার মত চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে মনে মনে খেপে উঠল রানা। বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। ওই কটা ফালতু কথা শোনাবার জন্যে ঘুম না ভাঙালেই কি চলত না।

নিজের ঘরে ফিরে এসে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ধরাবার পর গরম মেজাজটা ঠাণ্ডা হলো রানার। হঠাৎ খেয়াল হলো অপ্রয়োজনীয় কথা বলবার জন্যে তো বুড়ো নিজের কাছে ডাকে না কখনও ওকে। আজ কেন ডাকল? বেশিক্ষণ গবেষণা করতে হলো না ওকে। চীফের আসল উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলল ও। সারারাত মীটিং করে ফল যা হয়েছে তার আভাস দেবার জন্যই ডেকেছিলেন রানাকে। ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার ফাইন্যাল আলোচনা রানার সাথে করবেন এর মানে কি? কি বলবেন তা মেজর জেনারেল রাহাত খান জানেন না তা হতেই পারে না। অথচ খুলে বলল না বুড়ো। তার মানে প্রধানমন্ত্রী উৎসাহ দেবেন না রানাকে, দুঃখ প্রকাশ করবেন। কিসের জন্যে দুঃখ প্রকাশ?

পরিষ্কার ধরে ফেলল রানা ব্যাপারটা। কবীর চৌধুরীর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। হয়তো কবীর চৌধুরীকে ফাঁদে ফেলার কোনও পরিকল্পনা ফেঁদেছে ওরা সবাই মিলে। ফাঁদটা কি হতে পারে?

মন্টি সোরানো আগ্নেয়গিরিটা উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছে কি? প্লেন দিয়ে বোমা ফেলবে, মর্টার দিয়ে গোলা ছুঁড়বে আর ডিনামাইট ফিট করে উড়িয়ে দেবে কাসা বিলাভিসটা?

হঠাৎ ঠাণ্ডা একটা শিরশিরে অনুভূতি ওর পিঠ বেয়ে উঠতে শুরু করল। দুঃখ প্রকাশ করবেন প্রধানমন্ত্রী। সোহানার জন্যে।

নয়

লাঞ্চের আগে থার্ড সেক্রেটারি খবর দিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান সকাল আটটায় বেরিয়ে গেছেন, ফেরেননি এখনও। অবাক হলো রানা। এত

দেরি হচ্ছে কেন ওকে ডাকতে?

বাইরে লাঞ্চ সারার ইচ্ছা থাকলেও বেরুতে পারল না রানা। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, ভিতর ভিতর অস্থির হয়ে পড়ছে ও। শেষ পর্যন্ত কি শুনতে হবে কে জানে।

থার্ড সেক্রেটারি মাঝে-মধ্যেই খবর নিচ্ছেন লোক পাঠিয়ে ওর কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা। বেয়ারা লাঞ্চ দিয়ে যাবার পর দেরি করল না খেয়ে নিতে। এমন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করার কথা ভাবতে পারেনি ও। ভাল করে খেতে পারল না রানা। বেশির ভাগ খাবারই পড়ে রইল প্লেটে।

নির্জন মনে হচ্ছে বাড়িটাকে। যে-যার অফিস রুমে নিঃশব্দে কাজ করছে। গল্প করার জন্যে লাঞ্চের পর এসেছিলেন থার্ড সেক্রেটারি। রানার সম্পর্কে অসম্ভব কৌতূহল ভদ্রলোকের। কিন্তু ওর গম্ভীর হাবভাব দেখে উঠে গেছেন দশমিনিট পরই।

কফি নিয়ে এল বেয়ারা। কফির পেয়ালা শেষ করতে করতেই তিনবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা। বুড়ো কি হার্টফেল করেছে মীটিঙে বসে?

দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করল রানা বিকেল চারটেয়। কাপটা তেপয়ের উপর নামিয়ে রাখার সাথে সাথে নক হলো দরজায়।

অনুমতি পেয়ে থার্ড সেক্রেটারি ঢুকলেন রুমের ভিতর, 'মেজর জেনারেল অপেক্ষা করছেন ডাউনিং স্ট্রীটে আপনার জন্যে। গাড়ি তৈরি নিচে। আপনি...'

কথা শেষ হবার আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দ্রুতপায়ে রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। পিছন পিছন থার্ড সেক্রেটারি ওকে অনুসরণ করে এলেন, 'গেটে থাকবে প্রধানমন্ত্রীর চীফ অভ বডিগার্ড। পাস দেখালেই ভিতরে নিয়ে যাবে সে।'

নিচে নেমে গাড়িতে ওঠার আগে থার্ড সেক্রেটারির হাত থেকে ভিজিটিং পাসটা নিল রানা। 'ধন্যবাদ,' বলল ও।

গাড়ি ছেড়ে দিল শোফার।

দশ নম্বর বাড়িটার মেন গেটে রাতদিন গুটিকয় সাংবাদিক জটলা পাকায়। ওদের চোখকে ফাকি দেয়া সম্ভব নয় কারও পক্ষে। তাছাড়া গেট সংলগ্ন গার্ডরুমে ঢুকতে দেখেছে ওরা প্রধানমন্ত্রীর চীফ অভ বডিগার্ডকে।

রানা গাড়ি থেমে নামতেই হাঁটু মুড়ে পজিশন নিয়ে ফটো তুলে নিল জনাকয়েক ফটোগ্রাফার। এগিয়ে এল দ্রুত পায়ে চার-পাঁচজন নোট বুক আর বল পেন্সিল হাতে নিয়ে।

ওদেরকে পাত্তা না দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে খোলা গেটের দিকে এগোল রানা। গার্ড-রুম থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোক। হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহাস্যে বলল, 'আপনার সাথে মিলিত হয়ে আনন্দবোধ করছি, স্যার। দয়া করে আমার সাথে আসুন। প্রধানমন্ত্রী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

পকেট থেকে ভিজিটিং পাসটা বের করে চীফ অভ বডিগার্ডের হাতে দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল রানা। একপলক পাসটা দেখে নিয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দিল চীফ অভ বডিগার্ড।

করিডর, রিসেপশন রুম, হলরুম পেরিয়ে এলিভেটরে চড়ল ওরা। তারপর আবার রিসেপশন রুম, আবার হলরুম, তারপর আবার করিডর। কোথাও কেউ বাধা দিল না ওদেরকে। সোজা প্রধানমন্ত্রীর অফিস রুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজার দুই দিকে দুই পুলিস প্রহরী পাথরের মূর্তির মত নিঃসাড় দাঁড়িয়ে আছে। চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ে না যেন ওদের। নক করার পর একটি যুবতী দরজা খুলে ধরল। এটা ইনটিরিওর রিসেপশন রুম। ঘরের ভিতর ঢুকে এগিয়ে গেল ওরা ভারী পর্দা ঝোলানো একটা দরজার দিকে। কোন অনুমতি ছাড়াই চীফ অভ বডিগার্ড ঢুকল ভেতরে। নিয়ম অনুযায়ী অপেক্ষা করে রইল রানা। দশ সেকেন্ড পর ভিতর থেকে চীফ অভ বডিগার্ডের গলা ভেসে এল, 'প্লীজ, কাম ইন, স্যার।'

ভিতরে ঢুকে রানা চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল সবাইকে। পৃথিবীর সবাই উপস্থিত এখানে, মনে হলো ওর। বড় বড় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, ব্রিটেনের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি ও উর্ধ্বপদস্থ অফিসাররা, প্রধানমন্ত্রী ও মেজর জেনারেল রাহাত খান—এক ঘর লোক। রীতিমত গোলটেবিল বৈঠক। রাহাত খান পাইপ টানছেন একমনে। যেন কোন কিছুই জানেন না তিনি। প্রধানমন্ত্রীর মুখোমুখি বসেছেন তিনি। পাশের চেয়ারটা খালি।

রানার আপাদমস্তক দেখে নিল সবাই একযোগে ঘাড় ফিরিয়ে। একটি ঘাড় বড় সোজা, সেটি নড়ল না এতটুকু।

রানার পরিচয় জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। তারপর বসার অনুরোধ করলেন তিনি। চেয়ার থেকে উঠে রানার সাথে করদর্মন করলেন তিনি একা। নিঃশব্দে রাহাত খানের পাশের খালি চেয়ারটায় বসল রানা।

দেয়ালের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন কর্মচারী। প্রধানমন্ত্রীর পার্সোন্যাল সেক্রেটারি তাদের একজনকে ইঙ্গিত করতে একটা টেপ রেকর্ডারের বোতাম টিপে দিয়ে সেটাকে টেবিলের উপর রেখে লোকটা আবার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

টেপ-রেকর্ডার যখন আবিষ্কার হয়নি তখন প্রধানমন্ত্রীর মত লোকেরা কিভাবে কাজ সারত? মনে মনে ভাবল রানা।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে রানা পরিষ্কার ভাবে বলে গেল আগাগোড়া সম্পূর্ণ ঘটনাটা, প্রধানমন্ত্রীর দিকে সরাসরি চোখ রেখে। কবীর চৌধুরীর ক্ষমতা কতটুকু তা নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করল ও। উপসংহারে বলল, 'আমার চোখে, স্যার,' ওর চোখের পাতা পর্যন্ত নড়ল না বলার সময়, 'কবীর চৌধুরীর প্ল্যান সমস্ত পৃথিবীটা নিজের হাতের মুঠোয় আনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং সে-ক্ষমতা তার আছে।'

'মানুষকে আতঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি দেবার ইচ্ছেটা তার নীতির দিক থেকে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু পদ্ধতির দিক থেকে ভুল। হুমকি দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কিছুই সে আদায় করতে পারবে না,' ধীরে ধীরে বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'আপনার এবং গিয়াকোমার কথা অনুযায়ী সে পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আনতে চায়, আমরা বিভিন্ন উপায়ে যে খবরের আভাস পেয়েছি তাতেও তাই

প্রমাণ হয়। কিন্তু হুমকি তার খাটবে না কোনও ভাবেই। তাকে চরম শিক্ষা দেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। ইতিমধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলা হয়েছে। রাত একটায় সে তার হুমকি কার্যকরী করবে। রাত এগারোটায় সে কোর্টিনা থেকে এয়ারক্র্যাফটটা নিয়ে মন্টি সোরানোতে ফিরবে। ঠিক রাত এগারোটা পাঁচ মিনিটে শুরু হবে আমাদের অপারেশন। পাঁচটা বেস থেকে এক সাথে বম্বার্ডমেন্ট করা হবে মন্টি সোরানোয়। দশ মাইল দূর থেকে হেভি মর্টার ও মিসাইল ছুঁড়ে উড়িয়ে দেয়া হবে কাসা বিলাভিসটা। ডিনামাইট ফিট করার ব্যবস্থাও বাদ যায়নি। মন্টি সোরানোর আশপাশ থেকে গোপনে লোকজন সরানো শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।' রানার নিষ্পলক চোখের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন প্রধানমন্ত্রী, তারপর সম্পূর্ণ ভিন্ন কণ্ঠে কথা বললেন, সহানুভূতি আর বেদনা তাঁর কথায়, 'আমি জানি আপনার এক সহকর্মিনী কাসা বিলাভিসটায় বন্দী হয়ে আছে। এবং এ-ও শুনেছি তার ব্যাপারে আপনি কতটা সেন্টিমেন্টাল···মানে, কনসার্নড। আমাদের পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে মিস সোহানার মৃত্যু। জীবনে যতগুলো বেদনাদায়ক, মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি এটি তার মধ্যে অন্যতম। রিপোর্ট অনুযায়ী কবীর চৌধুরী পৃথিবীর মানুষকে ধ্বংস করার পদক্ষেপ নেবে রাত একটায়। মিস সোহানার জন্যে আমরা সবাই আঘাত পাব। কিন্তু তাকে উদ্ধার করার কোনও উপায় নেই আমাদের সামনে। মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চেয়ে এই ত্যাগকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। আমাদের সিদ্ধান্ত···'

শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রীর একটি কথাও কানে ঢুকছিল না রানার। ওর মনে হলো সটান দাঁড়িয়ে আছে ও। আশপাশের সবাই কড়া পাহারা দিচ্ছে ওকে। ও বন্দী। কোর্টের সেশন চলছে যেন। জজ ঘোষণা করছে। শাস্তি দেয়া হচ্ছে ওকে। না ওকে না, সোহানাকে। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়ে গেল।

রানা তাকাল প্রধানমন্ত্রীর দিকে, 'ভেরী গুড, স্যার। ইফ দ্যাট ইজ ইওর ডিসিশন।' কারও অনুমতির অপেক্ষা না করেই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও তারপর। ধীর পায়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী। 'আপনার মানসিক অবস্থাটা অনুভব করতে পারছি আমরা,' রানার কাঁধে হাত রেখে নিচু গলায় বললেন তিনি। 'আপনার মুখ চেয়ে বসে আছে সোহানা। কিন্তু এছাড়া আমাদের করার কিছুই নেই। একটা চরম যুদ্ধ বাধতে দিতে আপনিও রাজি নন, নিশ্চয়। অথচ মিস সোহানাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেলে ঠিক তাই ঘটবে। আশা করি আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না আপনি, মি. রানা।'

ওর মুখ দিয়ে একটি শব্দই মাত্র বের হলো, 'অভকোর্স নট, স্যার।'

বেরিয়ে এল রানা প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয় থেকে। কারও অপেক্ষা করল না ও। সোজা হেঁটে গেট দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে চেপে বসল। গাড়ি ছেড়ে দিল শোফার। রানা সিগারেট বের করে ধরাল একটা। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে গাল দিল ও, 'কুত্তার বাচ্চা!'

'কিছু বললেন, স্যার?' ইংরেজ শোফার প্রশ্ন করল।
'হ্যাঁ। সন অভ এ বীচ,' চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল রানা।
'কি বললেন, স্যার?' শোফার হতচকিত।
'ওহ্। আমার এক শত্রুকে বললাম। ডোন্ট মাইন্ড।'
এমব্যাসিতে ফিরে নিজের রুমে গিয়ে বসল রানা। চারটে বিশ বাজছে ঘড়িতে।
পাঁচ মিনিট পরই ওর ডাক পড়ল মেজর জেনারেলের চেম্বারে। ফিরে এসেছে বুড়ো। যাবার আগে অকারণেই শার্টের আস্তিন গুটিয়ে নেবার একটা ইচ্ছা হলো রানার। কিন্তু সময়ের অপব্যয় না করে সোজা চেম্বারে গিয়ে ঢুকল ও।
'বসো, রানা।'
রানা বসল। রাহাত খান পাইপে টোবাকো ভরছেন ধীরেসুস্থে। সারা গা জ্বালা করে উঠল ওর।
'এবার, স্যার?' মরিয়া ভাবটা কোনও রকমে চেপে প্রশ্ন করল রানা। মুখ তুলে তাকালেন রাহাত খান। কয়েক মুহূর্ত দেখলেন রানাকে।
'কিছু বলবার আছে তোমার, রানা?' শান্ত গলায় জানতে চাইলেন রাহাত খান।
বলবার নেই, করবার আছে, মনে মনে বলল রানা। এক ঘুসিতে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার···
মুখে বলল, 'ওদের কথাই শেষ কথা, স্যার?'
উত্তর দেবার আগে ধীরেসুস্থে পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন রাহাত খান। 'কথা তো একটাই। কিছু টের পাবার আগেই ধ্বংস করে ফেলতে হবে কবীর চৌধুরীকে। এরপর আর কথা কি?'
পাগল হয়ে গেছ তুমি, রানা বলল নিঃশব্দে। সোহানার কথা, যাকে তুমি জান দিয়ে ভালবাস তার কথা বেমালুম ভুলে যাবার ভান করছ। কপালের সেই শিরাটা ধক ধক করে লাফাচ্ছে কেন তোমার? ভেবেছ কিছুই টের পাচ্ছে না মাসুদ রানা?
'সোহানার কি হবে? ও মরবে জেনেও চুপ করে বসে থাকব আমরা?'
'তাছাড়া উপায় কি?' রানার দিকে চোখ তুললেন রাহাত খান, 'ওকে উদ্ধার করতে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কাউকে পাঠাবার কোনও ইচ্ছা নেই আমার। একজনকে হারাতে হচ্ছে, এই যথেষ্ট, দু'জনকে হারাতে চাই না আমি।'
চুপ করে রইলেন মেজর জেনারেল দু'মিনিট। নিজের অজান্তেই মাথা নাড়লেন একবার ভুরু কুঁচকে। অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওদের সিদ্ধান্তের সাথে আমি একমত, রানা। তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। তোমাকে আর দরকার হবে না ইউরোপে। রাত আটটায় একটা প্লেন আছে, করাচি যাচ্ছে। থার্ড সেক্রেটারি সব ব্যবস্থা করে রাখবে। তুমি সেই প্লেনে ফিরে যাচ্ছ। এটা অফিশিয়াল অর্ডার। এবার তুমি যেতে পারো।'

পাগলের সাথে কথা বলে লাভ নেই, মনে মনে বলে উঠে দাঁড়াল রানা চেয়ার ছেড়ে।

চুলে আঙুল চালাচ্ছেন একহাতে রাহাত খান, অন্য হাতের দুই আঙুলে পাইপটা ধরা, পা দুটোর বিশ্রাম নেই গত দশ-পনেরো মিনিট ধরে। ঘরের মধ্যে অবিরাম পায়চারি করছেন তিনি। অস্থির একটা ভাব ফুটে বেরুচ্ছে মুখের চেহারা থেকে। মাঝেমধ্যে ফোনটার দিকে কড়া চোখে তাকাচ্ছেন। মাঝেমধ্যে ঘড়ি দেখছেন হাত তুলে। কুঁচকে আছে কাঁচা পাকা ভ্রূজোড়া।

রানা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার দশ মিনিট পর এই খানিক আগে থার্ড সেক্রেটারি রিপোর্ট করে গেছে। দুটো পিস্তল চুরি গেছে তার টেবিলের দেরাজ থেকে। রানাকেও পাওয়া যায়নি এমব্যাসির কোথাও। অথচ কেউ বেরিয়ে যেতে দেখেনি ওকে। থার্ড সেক্রেটারির সন্দেহ ও জানালা গলে নেমে গেছে নিচে।

ঠিক পনেরো মিনিট পর রিং হলো ফোনের। থমকে দাঁড়িয়ে তাকালেন রাহাত খান ফোনের দিকে। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে রিসিভারটা তুলে নিলেন তিনি। 'ইয়েস?'

'ডবল ফোর নাইন বলছি, স্যার।' লন্ডনস্থ বি. সি. আই-এর এজেন্ট বলছে অপরপ্রান্ত থেকে, 'রানাকে পেয়েছি, স্যার। কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে সে। বাজার থেকে ছোট সাইজের কুড়াল, হাতুড়ি, ছেনি এইসব কিনে একটা ব্যাগে ভরে সোজা এয়ারপোর্টে এসেছিল খানিক আগে। রানওয়েতে ঢোকার চেষ্টা করলে গার্ডরা বাধা দেয় ওকে। দু'জনকে আহত করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে একটু আগে। একটা জেট পাঁচ মিনিট আগে ল্যান্ড করেছিল। সেটায় গিয়ে উঠেছে জবরদস্তি করে। জেটটা রানাকে নিয়ে এইমাত্র উড়েছে আকাশে। স্যার, আমার কোনও সন্দেহ নেই যে মাসুদ রানা হাইজ্যাক করেছে প্লেনটা। এখন আমি···'

'ফিরে এসো,' চাপা স্বরে কথাটা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন রাহাত খান। রানা তাঁর সব নির্দেশ অমান্য করে ছুটে চলেছে ইটালির দিকে।

নিজের চেয়ারে বসে একমনে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন রাহাত খান। নিভে যাওয়া পাইপের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটে।

'অসম্ভব, মিস্টার,' জার্মান পাইলট ঘোর আপত্তি জানাল। 'চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না কিছু। প্লেন কোথায় নামছে তা না জেনে—ধরুন, যদি একটা গর্ত থাকে রানওয়েতে? সবাই মরব আমরা—আপনিও বাঁচবেন না।'

রানা হাতের পিস্তলটা নেড়ে বিরক্তির সাথে বলল, 'বেশি বকবক করেন আপনি। যা বলছি তাই শুনুন। এখানেই নামাতে হবে প্লেন। প্লেন ক্র্যাশ হয়ে মরার ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু আমার কথা না শুনলে সে সুযোগও পাবেন না। নিন, তাড়াতাড়ি করুন।'

কো-পাইলটের দিকে ফিরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাইলট বলল, 'রেডি হও, বুঝলে? উন্মাদের পাল্লায় পড়া গেছে।'

কোনও দুর্ঘটনাই ঘটল না। নির্বিঘ্নে নামল জেট ফোগিয়া এয়ারপোর্টে। মাইলখানেক ছোটার পর দাঁড়িয়ে পড়ল প্লেনটা। ককপিটের দরজা খুলে লাফ মারল রানা। হাতের পিস্তলটা হাত থেকে পকেটে ভরেনি ও। অন্যহাতের ব্যাগটা লাফ দেবার আগে ফেলে দিয়েছে রানওয়েতে।

নিচে নেমে রানা বলল, 'দরজা বন্ধ করে দিন। পাঁচ মিনিট পর ওড়বার চেষ্টা করবেন আবার। ধন্যবাদ।' ব্যাগটা তুলে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রানা। তারপর চাঁদের আলোয় পথ দেখতে দেখতে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে। ঘড়ি দেখে নিয়ে চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল ও। রাত ন'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

সান নিকানডো রোড ধরে এক মিনিট হাঁটলেই মন্টি সোরানোর গা। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে পাহাড়ে উঠে আগ্নেয়গিরির দুই জ্বালামুখের মাঝখানে যাবার পরিকল্পনা করে লাভ হবে না কোনও। রানা ঠিক করল পাহাড়টা ডানদিকে রেখে সান নিকানডো রোডে না থেমে সোজা খানিকদূর গিয়ে সরু একটা পথ দিয়ে অ্যাপ্রিসিনা দিয়ে সান মার্কোয় যাবার রাস্তাটায় পৌঁছুতে হবে ওকে। ও রাস্তার পাশেই পাহাড় উঠে গেছে একেবারে খাড়া হয়ে। খাড়া হলেও ওখান দিয়েই উঠতে হবে ওকে। ওদিকটা দুর্গম বলে প্রহরীর নজর থাকবে কম, আর খানিকদূর ওঠার পর যদি দাঁড়াবার জায়গা পায় রানা তাহলে পাথর কেটে চেষ্টা করবে ও ভিতরে ঢোকার। পাহাড়ের গা ওখানে খুব চওড়া নয়, তাছাড়া ওখান দিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা সফল হলে কবীর চৌধুরীর আস্তানার একেবারে মাঝখানে পৌঁছুনো যাবে।

কিন্তু সান নিকানডো রোডে পৌঁছেই দুটো আলোর হলুদ চোখ দেখে দমে গেল রানা।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে মাঝরাস্তায়। হেডলাইট দুটো দেখতে পেয়েই রাস্তার পাশে ঝোপে লুকোল রানা। সম্ভবত ইটালিয়ান আর্মি টহল দিচ্ছে গাড়ি নিয়ে। দেখে ফেলেছে নাকি ওরা?

ঝোপের আড়াল থেকেই রানা দেখল লোক ক'জনকে। মোট তিনজন নামল গাড়ি থেকে। দু'জনের গায়ে ইউনিফর্ম। যা সন্দেহ করেছিল ও ঠিক তাই। আর্মি। কিন্তু তৃতীয়জন কে? লাল শার্ট গায়ে লোকটার, সাদা প্যান্ট। পকেটে একটা হাত ভরা। দু'জনের হাতে টমিগান। গাড়ি রেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে এদিকেই। কাঁটা তারের বেড়া ঘেঁষে হাঁটছে ওরা। বেড়ার ওপারে পঞ্চাশ গজ পরই পাহাড় শুরু। লাল শার্ট পরা লোকটা অপেক্ষাকৃত আস্তে আস্তে হাঁটছে। পঞ্চাশ গজ দূর থাকতেই পরিষ্কার চিনতে পারল রানা—গিয়াকোমা। লন্ডনেই জানতে পেরেছে ও গিয়াকোমার আসল পরিচয়। ইটালিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের লোক ও।

সৈন্য দু'জন পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছে। সন্দেহ করার কোনও কারণ পেল না রানা কিন্তু ধরে ফেলল ও গিয়াকোমার

আচরণে। পকেটে হাত দিয়ে হাঁটার কারণ কি গিয়াকোমার, ইচ্ছা করে পিছিয়ে পড়ছে কেন সে? কিন্তু সব বুঝেও করার কিছু নেই ওর। পিছন থেকে সরে যাবার উপায় নেই। সমতল ভূমি। ডানে-বাঁয়ে নিচু ঝোপ-ঝাড়। সামনে ফাঁকা রাস্তা। কিন্তু ওদের হাতে বন্দী হওয়া মানে নিজে রক্ষা পাওয়া এবং সোহানার মৃত্যু। রানা তা হতে দেবে না।

গিয়াকোমা কি গুলি করবে? প্রশ্নটার উত্তর পেল না। অসম্ভব নয়। রানা বন্ধু বলেই ওকে মৃত্যু গুহায় যেতে দেবার পথে হয়তো বাধা দেবে সে। দরকার হলে আহত করবে। খবর পেয়েই এসেছে ওরা ওকে ধরতে।

রানার কাছ থেকে দুই গজ দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে সৈন্য দু'জন। আর দু'এক পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে ওরা, অনুমান করল রানা। কিন্তু তার আগেই আধহাত কুড়ুলটা ছুঁড়ে মারল রানা রাস্তার অপর পারের কাঁটা তারের বেড়ার উপর। শব্দ শুনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দুই সৈন্য। গিয়াকোমাও সেদিকে ঘাড় ফিরিয়েছে। একলাফে কাছের আর্মিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ক্যাঙারুর মত। টমিগানটা ছিনিয়ে নিল পলকের মধ্যে। প্রায় একই সময়ে অব্যর্থ লাথিটা বসিয়ে দিয়েছে ও দ্বিতীয় সৈন্যের তলপেটে। সে ছিটকে পড়ে যাবার আগেই টমিগান ধরল রানা গিয়াকোমার বুক লক্ষ্য করে, 'সাবধান, দোস্ত, এটা ছেলেখেলা নয়,' বলতে বলতে রানা দুই লাফে গিয়াকোমার পিছন দিকে চলে গেল। দ্বিতীয় সৈন্যটা তখন টমিগান বাগিয়ে ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নিরুপায় সে। গিয়াকোমার পিছনে রানা। গিয়াকোমার পিঠে টমিগানের নলটা ঠেকিয়ে বলল ও, 'পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করে ডান পাশে পাঁচ হাত দূরে ফেলে দাও, গিয়াকোমা। আর তোমার সঙ্গীদের বলো টমিগান ফেলে দিয়ে দড়ির ব্যবস্থা করতে। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই ব্যাগটা পাবে ও।' কথা শেষ করেই এক পা পিছিয়ে এসে টমিগানের ট্রিগারে চাপ দিল রানা।

দুই আর্মির মাথার উপর দিয়ে দুই ঝাঁক বুলেট বেরিয়ে গেল। বাক্যব্যয় করল না গিয়াকোমা। পকেট থেকে রিভলভার বের করে ফেলে দিল সে। সশস্ত্র আর্মিটাও অনুসরণ করল তাকে। বলতে হলো না দ্বিতীয় বার, ঝোপের দিকে লক্ষ্মী ছেলের মত এগোল সে। ঝোপের ভিতর গিয়ে ঝুঁকে পড়ল। গিয়াকোমার সাথে লোকটা দৃষ্টি বিনিময় করল। ইশারা করল গিয়াকোমা। টের পেল না রানা।

উসখুস করছিল গিয়াকোমা। ডান পা-টা তুলে চুলকাচ্ছে সে বারবার। রানা কথা বলে উঠল, 'আমি এসেছি জানতে নিশ্চয়?'

'জানব না মনে?' গিয়াকোমা উত্তর দিল তিক্ত কণ্ঠে, 'ফোনে সব জানিয়েছে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স। প্লেনের শব্দও শুনেছি আমরা। তোমাকে দেখেও ফেলেছিলাম। তোমার ভাগ্য ভাল, রানা। অতি চালাকি করতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছি আমরা। যাকগে, তোমার উদ্দেশ্যটা কি?'

'উদ্দেশ্য ভাল নয়।' রানা হাসল, 'বুঝতেই পারছ।'

'তুমি কি মন্টি সোরানায় ঢুকতে চাও? তাতে কি মিস সোহানাকে রক্ষা করতে পারবে?'

'চেষ্টা করব।'

'ঢুকতেই পারবে না তুমি। ঢুকতে পারলেও দেরি হয়ে যাবে। তুমি বেরুবার আগেই ঝাঁক ঝাঁক প্লেন এসে গুঁড়ো করে দেবে মন্টি সোরানোকে। এক্সকিউজ মি, রানা—পিঁপড়ে মেরে ফেলল আমাকে...' বলতে বলতে পা চুলকাবার জন্যে বসে পড়ল গিয়াকোমা হঠাৎ।

ঝোপের কাছ থেকে সবেগে উড়ে এল ভারী একটা হাতুড়ি রানার মাথা বরাবর। বিদ্যুৎবেগে একপাশে সরিয়ে নিল রানা মাথাটা। মাথার আধ ইঞ্চি দূর দিয়ে উড়ে গিয়ে কাঁটা তারের বেড়ার দিকে চলে গেল হাতুড়িটা। টমিগানের বোতামে চাপ দিল রানা।

ঝোপের নিচের দিকে মুখ করে টমিগানের বোতাম টিপছে রানা। লোকটার গায়ে গুলি লাগল না একটাও। কিন্তু দু'হাত উপরে তুলে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। একটা হাতে দড়ির বান্ডিলটা দেখতে পেল রানা। গিয়াকোমা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল।

রানা কঠোর গলায় বলে উঠল, 'চালাকি, না?' আর্মির উদ্দেশে বলল ও, 'এদিকে আয়, শুয়োর। এই বাঁদরটাকে বেঁধে ফেল চটপট।'

বেশি কথার দরকার হলো না আর। গিয়াকোমাকে বেঁধে দড়ির বাকি অংশ অন্য সৈন্যের হাতে ধরিয়ে দিল রানার নির্দেশে। অপর জন তার দোসরকে বাঁধল। রানা বাঁধল শেষের জনকে। শেষে তিনজনের হাত বেঁধে গাড়ির দিকে হাঁটার নির্দেশ দিল ও। ওরা হাঁটতে শুরু করলে রানা হাতুড়ি আর আধহাতি কুড়ুলটাকে কুড়িয়ে নিল রাস্তার অপর দিক থেকে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দশটা বাজে।

হাসি পেল রানার। তিনজন একসাথে জীপের পিছনে ওঠার চেষ্টা করছে। ওরা উঠে বসল অতি কষ্টে। রানা ওদের পাগুলো অবশিষ্ট দড়ি দিয়ে বাঁধার পর ড্রাইভিং সীটে এসে বসল। পাদানির কাছে একটা বাক্সে গ্রেনেড দেখে পুলকিত বোধ করল ও। ঘুরিয়ে নিয়ে তীব্র বেগে ছুটিয়ে দিল জীপ।

মাইল আড়াই দূরে নিয়ে গিয়ে নিচু খাদের ধারে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে তিনজনকে নামিয়ে দিল রানা নানারকম কসরৎ করে। নামাবার পর আর একবার বাঁধল ও তিনজনকে একসাথে শক্ত করে। জীপের ভিতর দড়ির কমতি নেই। ফিরতি পথে রওনা হলো ও।

অ্যাপ্রিসিন দিয়ে সান মার্কোয় যাবার রাস্তায় এসে জীপ দাঁড় করাল ও। কেউ নেই এদিকটায়। একঘণ্টা মাত্র বাকি প্লেন অপারেশনের। মন্টি সোরানোর পশ্চিম দিকটার গা একেবারে খাড়া। এদিক দিয়ে পালাবার বা ঢোকার উপায় নেই বলে ধরে নেয়াটা স্বাভাবিক।

দুই পকেটে পিস্তল। কোটটা পরে নিল রানা ব্যাগ থেকে বের করে। কোটের দুই পকেটে রাখল চারটে হ্যান্ড গ্রেনেড। হাতুড়িটা নিল কোমরে গুঁজে। অব্যবহৃত টমিগান ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। টুকিটাকি বাকি জিনিসগুলো রইল পকেটেই।

আঙটা বাঁধা দড়ি ছিল জীপে। পাহাড়ে ওঠার জন্যেই। পশ্চিম দিকের

পাহাড়ের ত্বক অসমতল বলেই রক্ষে। আঙটা পঞ্চাশ কিংবা ষাট হাতের উপরে আটকে গেল ছুঁড়ে দেয়াতে। দেহের সমস্ত ভার দিয়ে ঝুলে পড়ে পরীক্ষা করল। জীপটার দিকে তাকাল। একশো গজের মধ্যেই রেখে যাচ্ছে ও গাড়িটাকে। পালাবার সময় এটাই একমাত্র সম্বল হবে ওর।

এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের গায়ে পা রেখে দড়ি ধরে ধরে অবলীলাক্রমে উঠে গেল রানা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাত। দশ সেকেন্ড জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে আবার উঠতে শুরু করার ঠিক আগের মুহূর্তে গাড়ির শব্দ কানে এল।

রানা জীপটাকে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে সেই জায়গায় আরও দুটো জীপ এসে দাঁড়াল। আগেই ভাবা উচিত ছিল। গিয়াকোমাদের খোঁজে ওরা আসবে তাতে আর আশ্চর্য কি। উপর থেকে দেখতে পেল রানা জীপ দুটোর কপালে ফ্ল্যাশ লাইটের বড় ঢাকনি।

এখন উপরে ওঠার চেষ্টা করলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যেতে হবে। দু'পাশে পালাক্রমে দেখে নিল রানা। ডান দিকে হাত দশেক দেখা যাচ্ছে। তারপর বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে পাহাড়ের গা। দড়ি ছাড়ল না ও। কিন্তু দড়ির সাহায্য না নিয়ে দুই হাত দিয়ে পাহাড়ের খাঁজ ধরে ধরে ডান দিকে এগোতে শুরু করল। দড়িটা দাত দিয়ে ধরে রেখেছে।

উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে ওর। বুঝতে বাকি রইল না রানার। দশটা পনেরো মিনিট হয়ে গেছে ঘড়িতে। পঞ্চাশ মিনিট বাকি আর। পাহাড় ভেদ করে ভিতরে ঢুকে দুইশো লোককে পরাজিত করে সময় থাকতে থাকতে এই কঠিন পথ দিয়ে সোহানাকে নিয়ে বেরিয়ে এসে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার চেষ্টা করা পাগলামি বলে মনে হলো ওর।

দশ হাত দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন আশার সঞ্চার হলো ওর বুকে। হাত তিনেক চওড়া একটা জায়গা, পাহাড়ের গা যেখানে বাঁক নিয়েছে তার হাত দেড়েক পরই। সেখানে দাঁড়িয়ে ও দেখল পাহাড় এখান থেকে নেমে গেছে ঢালু হয়ে জঙ্গলাকীর্ণ একটা সমতল ভূমির দিকে—সেখানে গভীর জঙ্গল। চাঁদের আলোয় জঙ্গলের মধ্যেকার সরু পায়ে চলা রাস্তাটা ঠিক চিনতে পারল রানা। পথটার উপর আগাছা জন্মেছে। তার মানে অব্যবহৃত পথ। চওড়া জায়গাটার উপর বসে পড়ে পাহাড়ের গা পরীক্ষা করল ও। বুকের ভিতর আনন্দে লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। আগন্তুক সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানাল মনে মনে। ওরা এসে ওকে নির্দিষ্ট পথ থেকে সরতে বাধ্য না করলে এতবড় সুযোগটা চোখে পড়ত না। পাহাড়ের গা ছিল না এখানে! ছিল গুপ্ত পথ, তারপর সিঁড়ির ধাপ। পথটা সিমেন্ট আর ইঁট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে কবীর চৌধুরী।

জুতোর শব্দ এগিয়ে এল। পাহাড়ের গায়ে ফ্ল্যাশলাইটের আলো পড়ল। কিন্তু দড়িটা আঙটা সমেত ছাড়িয়ে নিয়েছে রানা ইতোমধ্যেই নাড়া দিয়ে। ওকে দেখতে পেল না ওরা। কিন্তু ওর কানে অস্পষ্ট কথার শব্দ এল। নাম্বার ধরে কয়েকবার ডাকল ওরা। গিয়াকোমাকে ডাকছে। সাঙ্কেতিক নাম্বার। পনেরো মিনিট পর ফিরে গেল জীপ দুটো। কি ভেবে আগের জীপটাকে সাথে

করে নিয়ে গেল না ওরা।

জীপের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাবার পর পরই রানা নিজের কাজ শুরু করল। আধ হাত লম্বা বাঁটওয়ালা কুড়ুল দিয়ে সতর্ক ভাবে সিমেন্ট চটিয়ে ফেলার পর ইটের দেখা পাওয়া গেল। সিমেন্ট চটিয়ে ফেলে জায়গাটা আরও চওড়া করা দরকার। পনেরো মিনিট লাগল ওর একহাত লম্বা একহাত চওড়া জায়গার সিমেন্ট তুলে ফেলতে। শব্দ করল না রানা এতটুকু। শব্দের ভয়ে অত্যন্ত ধীরে কাজ করতে হচ্ছে। হু হু করে বয়ে যাচ্ছে সময়। দশটা পঁয়ত্রিশ ঘড়িতে। সময় নেই।

প্রথম ইঁটটা নামিয়ে আনতে তিন মিনিট লাগল ওর। সুড়ঙ্গের দেখা নেই তবু। তারপরও ইঁটটার উপরের, নিচের আর ডান-দিকের মোট চারটে ইঁট খসাতে আরও কাটল সাত মিনিট। এরপর দ্বিতীয় স্তরের ইঁটে হাত দিল রানা। আর বিশ মিনিট।

চারটে ইঁট খসাতে আরও সাত মিনিট লাগল ওর। সুড়ঙ্গ পাওয়া গেল। মাথাটা গলিয়ে দিয়ে এপার থেকে ওপারে গলে যেতে লাগল ও। গোটা দেহটা কোমর পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়ে হঠাৎ নিঃসাড় হয়ে গেল। পা দুটো রয়ে গেছে বাইরে। বাকি দেহটা একটা মৃদু আলোকিত প্যাসেজের দিকে ঢুকে পড়ছে। সামনেই জুতোর শব্দ। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে না কাউকে। কিন্তু জুতোর শব্দটা এগিয়ে আসছে। তিন সেকেন্ড নিঃসাড় থাকার পরই দ্রুত পা দুটো প্যাসেজের ভিতর নিয়ে এল রানা। সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওপার থেকে টেনে আনল টমিগানটা। উঠে দাঁড়াল ও। জুতোর শব্দ কাছাকাছি এসে আবার মিলিয়ে গেল দূরে। প্যাসেজের দশ বারো হাত দূরে, বাঁ দিকে সিঁড়ির একটা ধাপ দেখা যাচ্ছে। তারপর সোজা এগিয়ে গেছে প্যাসেজ, শেষ প্রান্তে মোড় নিয়েছে দুদিকে। সিঁড়ির ধাপ যেদিকে সেদিক থেকেই আসছে আলোর আভা। নিঃশব্দে এগোল রানা সেদিকে।

সিঁড়ির ধাপটার কাছে উঁকি মারল ও। তিনটে ধাপের পরই খোলা দরজা। ঘরের ভিতর বিরাট এক সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দু'পাশে দু'জন লোক বসে রয়েছে। একজন রানার দিকে মুখ করে বসে বই পড়ছে, দ্বিতীয়জন চুপচাপ বসে আছে পিছনে ফিরে। সিঁড়ির প্রথম ধাপটায় পা রেখে উপর দিকে তাকিয়ে কাঠের একটা মাচা দেখতে পেল রানা। টমিগানটা সেখানে রাখল নিঃশব্দে। পকেট থেকে পিস্তল বের করে বাঁ হাতে ধরল ও। দুটো সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে চৌকাঠের উপর গিয়ে দাঁড়াল। নিঃশব্দে একটা পা এগিয়ে দিল। তারপরই বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর দেহে।

পিছন ফিরে বসা লোকটার ঘাড়ে কারাতের এক কোপ মেরে মুখোমুখি বসা লোকটার বুক লক্ষ্য করে পিস্তল ধরল ও।

চেয়ার থেকে ঢলে পড়ে গেল কারাতের কোপ খাওয়া লোকটা। পড়ে আর নড়াচড়া করল না। দ্বিতীয় লোকটার হাত থেকে বইটা খসে পড়ল টেবিলের নিচে। উঠে দাঁড়াতে গিয়েও বসে পড়ল সে। দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়। রানা দ্রুত বলল, 'উঠে দাঁড়াও। মিস সোহানার রুমে নিয়ে চলো

আমাকে। জলদি।' ঘড়ি দেখল ও। এগারোটা পাঁচ বাজতে আর দশ মিনিট বাকি।

'ইয়েস, স্যার।' লোকটা টেবিলের কিনারে দুই হাত রেখে উঠে দাঁড়াল, 'কিন্তু অস্ত্রটাকে ভয় করে—একটু সরিয়ে নিন দয়া করে।'

'কথা নয়।' হঠাৎ রানা চমকে উঠে কান পাতল। বেল বাজছে দূরে। পরক্ষণেই লোকটার হাত দুটোর দিকে চোখ পড়ল ওর। টেবিলের কিনারায়, রানার চোখের আড়ালে ওয়ার্নিং বেলের বোতামটা চেপে ধরে রেখেছে লোকটা। পিস্তলের বাঁট দিয়ে বিদ্যুৎবেগে আঘাত করল ও লোকটার মাথায়। নিঃশব্দে চেয়ারে বসল লোকটা ধপাস করে, তারপর উল্টে পড়ে গেল চেয়ার সমেত। রানা দ্বিতীয় দরজা দিয়ে দুই লাফে একটা আলোকিত প্যাসেজে নেমে এল রুমের ভিতর থেকে। পঁচিশ তিরিশ হাত এগোবার পরই কোটের পকেটে হাত ঢোকাল ও। একদল লোক ছুটে আসছে। প্যাসেজটার শেষ প্রান্ত পঁচিশ গজ দূরে। মোড় নিয়েই দলটা রানাকে দেখতে পাবে একমুহূর্ত পরই। তার মানে নির্ঘাত মৃত্যু। দাঁত দিয়ে পিন ছাড়িয়ে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল রানা প্যাসেজের দিকে। তিন কদম এগিয়ে বন্ধ একটা দরজার গায়ে ধাক্কা মারার উপক্রম করছিল রানা, দরজাটা অকস্মাৎ সশব্দে খুলে গেল ভিতর থেকে। কপালে লাগল কবাট। কিন্তু সামলে নিল ও। কবাটটা সজোরে বন্ধ করে দিতেই রুমের ভিতরের লোকটার নাকে গিয়ে ধাক্কা মারল সেটা। আবার এক টানে কবাট খুলে এক লাফে রুমের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা। আহত লোকটাকে ডিঙিয়ে খোলা দরজা দিয়ে দ্বিতীয় একটি ঘরের দরজা পেরিয়েই দু'হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়াল রানা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ফ্যালকন। তার হাতে একটা ল্যুগার পিস্তল। রানার জন্যে ঘরের মাঝখানে অপেক্ষা করছিল সে।

গুপ্ত টি. ভি. সেটের কথা মনে পড়ল রানার।

'পিস্তল ফেলে দাও, রানা,' আদেশ জারি করল ফ্যালকন। উপায় নেই রানার। পিস্তলটা ছেড়ে দিল ও উপর দিকে ওঠানো হাত থেকে। খট্ করে শব্দটা মিলিয়ে যাবার আগেই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে তুলল মেঝে। ঠিক সময়ে লাফিয়ে পড়ল রানা। ফ্যালকন বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই নাকের উপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ল দেয়ালের গায়ে। এবার তলপেটে লাথি চালাল রানা। ফ্যালকন জ্ঞান হারিয়েছে দেখে নিজের পিস্তলটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে দ্বিতীয় দরজা পেরিয়ে ছুটল রানা। আরও দুটো খালি ঘর পেরিয়ে একটা প্যাসেজে এল ও। নির্জন প্যাসেজ। চারদিকে জুতোর শব্দ। মাঝে মাঝে গুলি হচ্ছে। চিৎকার করে ডাকাডাকি করছে সবাই। হুলস্থূল পড়ে গেছে কাসা বিলাভিসটায়। কবীর চৌধুরীর ফিরে আসতে আর তিন মিনিট। গোটা পাহাড় ধ্বংস হতে বাকি আট মিনিট। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে এখন। সোহানাকে নিয়ে পৌঁছতেই হবে জীপের কাছে।

পিছন দিকে বারবার তাকাতে তাকাতে সামনে এগিয়ে চলল রানা।

কাসা বিলাভিসটার সব জায়গা পরিচিত নয় ওর। কোন দিকে চলেছে ও কে জানে। ঘড়ি বলছে সাত মিনিট সময় বাকি আর। দমে যাচ্ছে বুকটা। দু'মিনিটের মধ্যেই এয়ারক্র্যাফট নিয়ে ফিরে আসবে কবীর চৌধুরী। তারপর বাকি থাকবে পাঁচ মিনিট। অসম্ভব, পালাবার কথা পাগল ছাড়া ভাবতে পারে না কেউ। কোনদিকেই কোন উপায় নেই। নিশ্চিত মৃত্যু! কিন্তু এখন ভাবছে না রানা কিছুই। এখন একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় সে।

দ্রুত দৌড়ুতে শুরু করল রানা। পিছন দিকে গুলির শব্দ। সেই সাথে চার-পাঁচজনের ছুটে আসার পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। বাম হাতে পকেট থেকে একটা গ্রেনেড বের করল ও। পিস্তলটা ডান হাতে। প্যাসেজের গায়ে কোন দরজা নেই। মরিয়া হয়ে ছুটছে ও। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রানা। পদশব্দ এসে পড়েছে। পিছনে, সামনেও।

মোড় নিতেই সামনে দেখা গেল শত্রু। স্টেনগানটা তুলে লক্ষ্য স্থির করার আগেই গুলি করল রানা। বুকে গিয়ে বিঁধল বুলেট। বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ল লোকটা। পিছনে ফিরে না তাকিয়ে গ্রেনেডের পিন আলগা করে জোরে গড়িয়ে দিল রানা। তারপর দ্রুত ছুটে নিহত লোকটাকে টপকে মোড় নিয়ে একটা খোলা দরজা দেখতে পেল সে। দরজা দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে হলরুমে ঢুকল রানা। চিনতে পারল ও। হলরুমের একটা দরজা দিয়ে ঢোকা যাবে লিফটে। এই সোজাসুজি তিন তলার উপর সোহানার রুম।

লিফটের দরজা খুলতেই পরপর চারটে গুলি বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। আগেই সন্দেহ করছিল রানা। লিফটের বোতাম টিপেই বসে পড়েছিল ও। গুলি করতে করতে বেরিয়ে আসছে মানাটোফ। ওকে গুলি করল রানা। কিন্তু ঠিক জায়গায় লাগেনি রানার গুলিটা। মানাটোফের মুখের ডান দিকটায় দগ দগ করছে ঘায়ের মত টাটকা ক্ষত। রক্তের ধারা গলার দিকে নেমে আসছে ক্ষত থেকে।

দ্বিতীয়বার পিস্তলের ট্রিগারে চাপ দেবার আগেই লাথিটা এসে লাগল রানার বুকে। চিৎ হয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল রানা। মানাটোফ লিফটের বাইরে নেমে এসে টাল সামলাতে সামলাতে লক্ষ্য স্থির করছে রানার মাথা বরাবর। পা দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ধাক্কা মারল রানা। লাফ মেরে হলরুমের খোলা একটা দরজার দিকে দৌড় দিল ও। মানাটোফ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আরও দুটো গুলি করল। চিৎকার করে বলল, 'বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গেল—ধরো ওকে...'

অন্য একটা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে তিনজন লোক ঢুকল হলরুমে। শব্দ পেয়েছিল রানা। মানাটোফকে শেষ না করেই হলরুম থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে ওকে। হলরুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ ধরে ছুটল রানা। সামনেটা ফাঁকা। কিন্তু নিশ্চিত হবার জন্যে দুটো গুলি চালাল ও। ঝট্ করে খুলে গেল দুটো দরজা। প্রথম দরজাটা হাত তিনেক দূরে। গুলি করল রানা। চৌকাঠের উপরই পড়ল একজন বুকে হাত চেপে ধরে। লাফ মেরে চৌকাঠের ভিতরে চলে গেল রানা। হাতটা বের করে গুলি করল দ্বিতীয়বার। প্যাসেজে বেরিয়ে

এসেছিল দ্বিতীয় দরজাটা খুলে। হাত পনেরো দূর থেকে এক ঝাঁক বুলেট এসে দরজার কবাটে লাগল। মাথা বের না করে আবার গুলি করল রানা। আর একটা চিৎকার উঠল সাথে সাথে। শব্দ হলো ধাতব বস্তু পাথরের মেঝেতে পড়ার। স্টেনগানটা পড়ার পর দুই সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা। তারপর দেহটা পড়ার শব্দ শুনতে পেল রানা। রুমের ভিতর থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে আবার ছুটতে আরম্ভ করল। মোড় নিতেই দেখা গেল সিঁড়িটা।

একতলায় উঠে কাউকে দেখতে পেল না রানা। দোতলায়ও কেউ নেই। কি ব্যাপার?

পিছনের সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ। লাফিয়ে বাকি ধাপ ক'টা পেরিয়ে বারান্দা ধরে ছুটতে ছুটতে সোহানার দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারল রানা।

দরজা খোলাই ছিল। সোহানা দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্বিতীয় দরজাটার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে। আতঙ্কিত দৃষ্টি। ভিতরে ঢুকল রানা। তারপরই সোহানার পিছনের দরজাটা খুলে গেল নিঃশব্দে। মানাটোফ সোহানার পিঠে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে হা হা করে বিকট স্বরে হেসে উঠল। হাসি থামতে খালি হাতটা দিয়ে গলা থেকে রক্তের ধারা মুছে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'অনেক হয়েছে, রানা। এবার পিস্তলটা ফেলে দাও।'

হিসেব করছিল রানা। ছ'টা গুলি করেছিল মানাটোফ। ও কি অস্ত্রটা বদলেছে বা গুলি ভরেছে নতুন করে? রানার পিস্তলে গুলি আছে মাত্র একটা।

সময় নেই। আর মাত্র এক মিনিট আছে কবীর চৌধুরী এসে পড়ার। পিছনের বারান্দায় পদশব্দ, গুলির শব্দ। মানাটোফ জড়িয়ে ধরেছে একহাতে সোহানাকে। রিভলভারের নলটা সোহানার কপালের বাঁ পাশে ঠেকানো। আদেশ অমান্য করলেই ট্রিগার টিপবে ও। মাথার উপর ধীরে ধীরে হাত তুলতে শুরু করল রানা।

এক টুকরো হিংস্র হাসি ফুটে উঠল মানাটোফের ক্ষত-বিক্ষত মুখে। গা ঘিন ঘিন করে উঠল রানার। মানাটোফের একদিকের চোয়াল নেই বললেই চলে। লোকটা এখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কি করে সেটাই আশ্চর্য।

হাত উপরদিকে ওঠাবার সময়েই ট্রিগার টিপল রানা। সন্দেহ করেনি মানাটোফ। কিন্তু প্রস্তুত ছিল। ডান হাতের কনুইয়ের কিছুটা উপরে গিয়ে লাগল গুলি। ট্রিগারটা টিপে ধরল ও তার আগেই। চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল সোহানা। কিন্তু গুলির শব্দ হলো না। চেম্বার খালি মানাটোফের রিভলভারের। ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ওর উপর। পিস্তলের বাঁটটা ভেঙে যাবার উপক্রম হলো ওর মাথার সাথে সংঘর্ষে। ঢলে পড়ল মেঝেয় মানাটোফের মোটা দেহটা। ফেলে দিল রানা পিস্তল। সোহানা রানার হাত ধরে বলল, 'তুমি আসবে আমি জানতাম, রানা!'

মানাটোফ যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা প্যাসেজে। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে দলটা সোহানার ঘরে।

ঘড়ি দেখল রানা। আর ছয় মিনিট। পৌঁছুতে পারবে ওরা জীপের কাছে?

প্যাসেজটা পরিচিত ঠেকল রানার। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

দ্রুত একটা গ্রেনেড বের করে রুমের ভিতর ছুঁড়ে দিল ও পিন ছাড়িয়ে। তারপর সোহানার হাত ধরে ছুটতে শুরু করল প্যাসেজের শেষ প্রান্ত লক্ষ্য করে। পকেটের দ্বিতীয় পিস্তলটা বের করে হাতে রাখল রানা।

প্যাসেজের শেষে স্টীলের প্রকাণ্ড দরজাটা। পিছনে বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল মেঝে। বিরাট তালাটার মাঝখানে গুলি করল রানা পরপর দুটো। ভেঙে গেল তালা। দরজা খুলে সোহানাকে নিয়ে লিফটে উঠল ও।

লিফট নেমে এল নিচে। নিঃশব্দে লিফট থেকে নামল রানা। পিস্তলটা সোহানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ইশারা করল হাত দিয়ে। সোহানা আলোকিত জ্বালামুখের বিরাট মেঝেতে নামল বিস্ফারিত চোখে। রানার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে দেয়াল ঘেঁষে এগোতে শুরু করল ও। পঞ্চাশ গজ দূরে, মাঝামাঝি জায়গায় দেখা যাচ্ছে গর্তটা। কবীর চৌধুরীর এয়ারক্র্যাফট আর ক'সেকেন্ড পর ওখানেই এসে নামবে।

সোহানা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাত এগিয়ে একটা চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ির আড়ালে আত্মগোপন করল। কাঁচ ঘেরা কন্ট্রোল রুমে দু'জন লোক বসে বসে যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করছে। কাঁচের ঘরটা সাউন্ড প্রুফ, রানা অনুমানেই তা বুঝতে পারল। লোক দু'জন কিছুই জানে না উপরে কি ঘটে গেছে।

নিঃশব্দ পায়ে এগোতে লাগল রানা। দশ সেকেন্ডে দশ পা অতিক্রম করে থামল ও। দরজাটা খোলা। কন্ট্রোলরুমে দু'জনের কানেই হেডফোন। টেবিলের ওপর একটা কোল্ট অটোমেটিক রেখে কথাবার্তা বলছে ওরা কবীর চৌধুরীর সাথে। দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে আরও খানিকটা এগোল রানা।

'রুফ উইথড্রন!' একজন অপারেটর আওড়াল। কথাটা বলেই হেডফোন খুলে ফেলে পিছন দিকে তাকাল সে। রানাকে দেখেই ছানাবড়া হয়ে উঠল তার চোখ দুটো। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। গলার পাশে প্রচণ্ড এক কারাতের কোপ খেয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল লোকটা দ্বিতীয় জনের উপর। টেবিলের উপর থেকে পিস্তলটা তুলে নিল রানা, যেন নিজের জিনিস। দ্বিতীয় অপারেটরের হাত পকেটে চলে গেছে, কিন্তু বেরিয়ে আসার আগেই মারা গেল সে চেয়ারে বসা অবস্থায়। কোল্টের গুলিতে ফুটো হয়ে গেছে তার হৃৎপিণ্ড।

সরে গেছে আগ্নেয়গিরির উপরের অংশের কৃত্রিম ছাদ। এয়ারক্র্যাফটের মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি কানে এল। নামছে সেটা। ধীরে ধীরে নেমে আসছে।

কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটল না। নিরাপদে নামল এয়ারক্র্যাফট নির্দিষ্ট জায়গায়। কাঁচ ঘেরা কন্ট্রোলরুম থেকে এয়ারক্র্যাফটটার পেটের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রানা। মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি থেমে গেল হঠাৎ।

দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল এয়ারক্র্যাফটের। কবীর চৌধুরীর একটা পা দেখা গেল নিচের দিকে নেমে আসছে। সিঁড়ির ধাপে পা রেখে রেখে গর্তের ভিতর নেমে পড়ল সে। তিন সেকেন্ড পর আবার উঠতে শুরু করল। এবার অন্য একটা সিঁড়ি বেয়ে। উপরে উঠে কন্ট্রোলরুমের দিকে চোখ ফেলল কবীর চৌধুরী। এবং থমকে দাঁড়াল।

একা রানাকে কন্ট্রোলরুমে দেখতে পেয়ে বোকার মত তাকিয়ে রইল কবীর চৌধুরী দুই সেকেন্ড। তারপরই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। সোহানার গলা শোনা গেল কবীর চৌধুরীর পিছন থেকে, 'খবরদার, চৌধুরী। মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। হাত বের করে ফেলো। খালি হাত।'

সোহানার কথা শেষ হবার সাথে সাথে লিফটের দরজা খুলে গেল। পাঁচ ছ'জন লোক উত্তেজিত ভাবে নেমে পড়ল লিফট থেকে। দ্রুত পায়ে আসছে এদিকে।

কবীর চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গুলি করল সোহানা। তার আগেই লাফিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল কবীর চৌধুরী। কিন্তু বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা। গুলি লেগেছে পিঠে।

রানা সেদিকে লক্ষ না করে লিফট থেকে যে লোকগুলো নেমেছে তাদের দিকে পিস্তলের মুখ করে গুলি করল পরপর চারটে। সোহানা আবার গুলি করল দুটো।

ছয়জনই সিনেমার ডামির মত ঢলে পড়ল লিফটের সামনে। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এরই মধ্যে পিস্তল বের করল দু'জন। আরও দুটো গুলি করল রানা।

কবীর চৌধুরী আহত অবস্থায় ছটফট করছে মেঝেতে শুয়ে। হাতে পিস্তল। পাশ ফিরল সে।

কন্ট্রোলরুম থেকে বেরিয়ে কবীর চৌধুরীর হাত লক্ষ্য করে গুলি করতে গিয়েও নিরস্ত হলো রানা। গুলি নেই। সোহানার দিকে লক্ষ্যস্থির করেছে কবীর চৌধুরী। রানা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সোহানা। কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে সে।

একটা লাথি মারল রানা কবীর চৌধুরীর হাতে। রিভলভারটা ছিটকে চলে গেল কয়েক হাত দূরে। কি ভেবে হঠাৎ থমকে গেল রানা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আর দুই মিনিট!

সোহানাকে টেনে নিয়ে দৌড় মারল ও এয়ারক্র্যাফটের দিকে। লাফ দিয়ে নামল ওরা অগভীর গর্তটায়। এয়ারক্র্যাফটের দরজা খুলেই সোহানাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল রানা ধাক্কা মেরে।

পিছন দিকে তাকাল রানা। উঠে দাঁড়িয়েছে কবীর চৌধুরী যন্ত্রণায় না আক্রোশে বুঝতে পারল না রানা, দাঁতে দাঁত চেপে, দুই হাতের মুঠি শক্ত করে, দুই চোখ বিস্ফারিত করে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে সে।

এয়ারক্র্যাফটের ভিতর উঠে গেল রানা। দরজা বন্ধ করে দেবার আগে কবীর চৌধুরীর প্রায়োন্মাদ চেহারার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মায়া হলো ওর।

দশ

পাগলের মত সুইচ বোর্ডের বোতাম টিপতে শুরু করল রানা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। স্টার্ট নিচ্ছে না এয়ারক্র্যাফট। অথচ এটাই এখন একমাত্র ভরসা।

ঘড়ির দিকে তাকাতে ভয় করছে রানার। শেষবার দেখেছে ও, তখন সত্তর সেকেন্ড বাকি ছিল।

'কিসের শব্দ হচ্ছিল, রানা?' সোহানা জিজ্ঞেস করল হঠাৎ। শুনতে পেয়েছে রানাও। জানে কিসের শব্দ ওটা। অসংখ্য বোমারু বিমান ছুটে আসছে। উত্তর দিল না ও। সুইচ বোর্ডের বোতামগুলো একটার পর একটা টিপে যাচ্ছে রানা। হাতলগুলোও বাদ দিচ্ছে না।

প্লেন রানা চালিয়েছে আগে। কিন্তু স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কোন প্লেনের সাথেই এটার কোন মিল নেই। কিন্তু সময়ও তো নেই আর!

হঠাৎ গুঞ্জন ধ্বনি কানে ঢুকল। ঘেমে গেছে রানা। পাগলের মত দুটো হাতল ধরে টান মারল ও। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সোহানা, 'হালকা বোধ হচ্ছে কেন, রানা!'

টিভির সুইচগুলো চিনে ফেলেছে ইতোমধ্যে রানা। চারটে পর্দার দিকে পালাক্রমে তাকাল ও, তারপর হঠাৎ সব ছেড়ে দিয়ে পাশের চেয়ার থেকে সোহানাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টেনে এনে রাক্ষসের মত চুমু খেতে শুরু করল গালে, ঠোঁটে, নাকে। সোহানা চেঁচিয়ে উঠল, 'এই ছাড়ো, ছাড়ো, কি হচ্ছে!'

'বেঁচে গেছি সোহানা! বেঁচে গেছি এ যাত্রা! হুররে…'

টিভির পর্দার দিকে চোখ রাখল রানা হঠাৎ সোহানাকে ছেড়ে দিয়ে। অসংখ্য বোমারু বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে নিচের দিকে। সোহানা সেদিকে চোখ ফেলেই চেঁচিয়ে উঠল, 'একি, রানা, সিনেমা হচ্ছে নাকি?' ব্যাপার কিছুই জানে না ও।

অল্টিমিটারের দিকে চোখ রেখে রানা বলল, 'আচ্ছা সোহানা, বলো তো আমরা এখন কোথায়?'

'কেন, কাসা বিলাভিসটায়।'

'না, মেম সাহেব, না।' রানা হাসল, 'আমরা এখন মন্টি সোরোনা আগ্নেয়গিরির চূড়া থেকে পাঁচ মাইল উপরে। ওই দেখো বোমা ফেলা হচ্ছে পাহাড়ের ওপর।' না জেনেই বোতাম টিপল রানা একটা, দুটো হাতল টানল। স্পীডমিটারের দিকে চোখ রেখে ঢোক গিলল ও। তারপর যেন কিছুটা হতভম্ব হয়েই বলল, 'এখন আমরা ছুটছি, প্রতি সেকেন্ডে পাঁচ মাইল করে। মাটি থেকে পনেরো মাইল উপর দিয়ে। দেখো, দেখো সোহানা, টিভির পর্দায়

প্যারিস সিটি দেখা যাচ্ছে।'

'রানা!' সোহানা শঙ্কিত গলায় বলল, 'শেষ পর্যন্ত তুমি পাগল হয়ে গেলে!'

আধ মিনিট কথা বলতে পারল না রানা। তারপর বোকার মত বলে উঠল, 'বাঁচার কোনও উপায় নেই, সোহানা। আমি চালাতে জানি না এই এয়ারক্র্যাফট।'

'হ্যালো,' ওয়্যারলেসের মাউথপিসটা মুখের সামনে তুলে ধরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল রানা পৃথিবীর সাথে। একই সাথে বোতাম টিপছে ও।

টিভির পর্দায় দৃষ্টি পড়তেই ছানাবড়া হয়ে উঠল চোখ জোড়া। দাঁড়িয়ে আছে গ্রেট ব্রিটেন টিভির পর্দায়। তার মানে মহাশূন্যে স্থির হয়ে আছে এয়ারক্র্যাফট গ্রেট ব্রিটেনের মাথার উপর।

দুঃখে কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করল রানার। কোন্ বোতাম টেপার ফলে এয়ারক্র্যাফটটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে তা লক্ষ করেনি ও।

'কি হলো তোমার?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল সোহানা। ঘড় ঘড় করে শব্দ হলো ওয়্যারলেসে।

সেটটা খোলা আছে মনে পড়ল রানার। মাউথপিসটা মুখের সামনে তুলে ধরে রানা চেঁচিয়ে উঠল, 'হেলপ! হেল্প!'

উত্তর এল না কোনও।

রানা একটা হাতল টানতে গিয়ে অকস্মাৎ চমকে উঠল। হাত নড়ল না ওর। মনে পড়ে গেল কবীর চৌধুরীর কথা। সে বলেছিল এই এয়ারক্র্যাফট কোন আনাড়ি লোক চালাতে গেলে স্রেফ আত্মহত্যা করবে। এমন একটি বোতাম বা হাতল আছে যেটা চাপ দিলে বা টান মারলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে এয়ারক্র্যাফটটা।

'হেল্প!' রানা আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'হেল্প!'

এগিয়ে এল সোহানা। 'কি হয়েছে, রানা? এরকম করছ কেন? মাথা...'

'না, মাথা খারাপ হয়নি এখনও। কিন্তু শিগ্গিরই হবে। তোমারও।' বিষণ্ন হাসি হাসল রানা, 'শোনো তাহলে...' গড় গড় করে বলে গেল ও সব কথা।

আঁতকে উঠল সোহানা, 'সর্বনাশ! এবার তাহলে নিশ্চয় মরব আমরা, রানা!'

রানা উত্তর দিল না। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে একবার সুইচবোর্ডের বোতাম আর হাতলগুলো দেখল। প্রায় একশোর মত বোতাম। এক একটার কাজ এক এক রকম। হাতলের সংখ্যা পঞ্চাশটার মত। ছোট বড় বিভিন্ন আকারের। সবচেয়ে বড়টি সর্ব বাঁয়ে। সেটার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল রানা। মনে মনে ঠিক করল প্রাণ থাকতে ওই হাতলটা ধরে টান মারবে না ও। কেমন যেন সন্দেহের সৃষ্টি করছে মনে ওটা। বড় বলেই হয়তো। কিন্তু কে জানে। ওটা ধরে টানলেই এয়ারক্র্যাফটটা ধ্বংস হয়ে যাবে কিনা কেউ বলতে পারে?

'ওয়ান ফোর ফাইভ কলিং...ওয়ান ফোর...!' ওয়্যারলেসে শব্দ ভেসে

আসছে।

চমকে উঠে মাউথপীসটা মুখের সামনে তুলল রানা, 'হেল্প! হেল্প!'

ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল, 'লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি আমরা। কিন্তু পরিষ্কার করে বলুন। কোথা থেকে বলছেন আপনি?'

রানা চিৎকার করে উঠল, 'লন্ডনের ঠিক মাথার উপরে আমরা। মাটি থেকে···' অল্টিমিটার দেখে নিল রানা, 'আঠারো মাইল উপরে। স্পেশাল এয়ারক্র্যাফট এটা। আটকা পড়েছি আমরা দু'জন এর ভিতর। আমরা কেউ চালাতে জানি না এটা। সুইচের নিচে কিছু লেখা নেই। আমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারবেন কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনারা এক্ষুণি পাকিস্তান এমব্যাসিতে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে একটা খবর দিন।'

'আপনার নাম কি, স্যার?' বিমূঢ় কণ্ঠ ভেসে এল, 'আমাদের রাডারে পাওয়া গেছে আপনাদের এয়ারক্র্যাফট। পৃথিবীর বাসিন্দা তো আপনি?'

'সময় নষ্ট করবেন না,' বলল রানা, 'যা বলছি তা করলে আমরা হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতে পারি।'

'কত মাইল উপরে বললেন, স্যার? আঠারো মাইল? অ্যাবসার্ড! হাউ এভার, আপনার নাম কি বলব, স্যার?'

'মাসুদ রানা।' রানা চেঁচিয়ে বলল, 'এমব্যাসিতে ফোন করে আমার নাম বললেই হবে।'

'ইয়েস, স্যার।' ক্ষীণ যান্ত্রিক স্বর ভেসে এল, 'আমি যোগাযোগ করছি। আপনি অপেক্ষা করুন।'

সোহানা বলে উঠল, 'এমব্যাসিতে খবর পাঠিয়ে কি লাভ হবে?'

'মাফ চেয়ে নেব বুড়োর কাছ থেকে শেষ সময়ে, এই লাভ। জীবনে আর দেখা হচ্ছে না—হয়তো। মনে মনে অনেকবার নরকে পাঠিয়েছি ওঁকে,' রানা গম্ভীর ভাবে বলল।

'ঠাট্টা রাখো। এলোপাতাড়ি টিপতে থাকো না বোতামগুলো। একটা না একটা কাজে লেগে যাবে হয়তো। খামোকা শূন্যে ঝুলে থেকে লাভ কি?'

'তাই করব, কিন্তু আগে বুড়োর কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে নিই।'

সোহানা কি বলতে যাচ্ছিল, ওয়্যারলেসে শব্দ ভেসে এল, 'আপনারা কোন্ ভাষায় কথা বলছেন, স্যার?' অপারেটরের কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময়। ওদেরকে মঙ্গলগ্রহের অধিবাসী বলে ধরে নিয়েছে কিনা কে জানে।

'কেন? ভাষাটা খুব মিষ্টি লাগছে বুঝি?' রানা টিটকারি মেরে বলল।

'সত্যি তাই, স্যার!' অপারেটর অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'অনেকটা আমাদের পৃথিবীর ভাষারই মত। আপনাদের ভাষাটা কোথাকার, মানে কোন্ গ্রহের জানতে পারলে···'

রানা ধমক লাগাল, 'বাজে কথা রাখুন। খবর পাঠিয়েছেন এমব্যাসিতে?'

'ইয়েস, স্যার। এমব্যাসি থেকে লোক আসছেন আমাদের কন্ট্রোলরূমে,' বলল অপারেটর।

রানা বলল, 'তাহলে চুপচাপ থাকুন।'

'ইয়েস, স্যার।'

সোহানা আবার বলল, 'কোন আশা দেখতে পাচ্ছি না, রানা। উদ্ধার পাওয়ার কোনও পথ নেই। কিন্তু এ নিয়ে ভেবেও লাভ নেই। যা হবার হবে।'

রানা কথা বলল না। ঘড়ি দেখল ও। সাড়ে এগারোটা। মন্টি সোরোনা এবং কাসা বিলাভিসটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। কবীর চৌধুরীর স্বপ্ন শেষ। কবীর চৌধুরী শেষ···রয়েছে কেবল তার আশ্চর্য কীর্তি—এবং সেটা জ্বালিয়ে মারছে ওদের।

'আমার কিন্তু ভালই লাগছে, রানা। দাও যে কোন একটা বোতাম টিপে, চলে যাই চাঁদে।'

সোহানার কথা শেষ হতেই মেজর জেনারেল রাহাত খানের ভারী গলা ক্ষীণ ভাবে ভেসে এল ওয়্যারলেসের মাধ্যমে। 'কি ব্যাপার, রানা?'

সব কথা খুলে বলল ও রাহাত খানকে।

রানার কথা শেষ হতেও অপর প্রান্ত থেকে কোনও উত্তর এল না।

আধমিনিট অপেক্ষার পর রাহাত খানের বিচলিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'সর্বনেশে কাণ্ড! পথ দেখতে পাচ্ছি না কোনও। দু'একটা বোতাম বা হাতল নাড়াচাড়া করে দেখো দেখি। মনে আছে কোন্‌গুলো কি বেগে নাড়াচাড়া করেছ?'

'স্পষ্ট মনে নেই, স্যার···'

'যেগুলো মনে আছে সেগুলোই শুধু নাড়াচাড়া করো। বাকিগুলোয় হাত দিয়ো না। রানা?' রাহাত খানের কণ্ঠস্বর নরম না কঠোর বোঝা গেল না অতদূর থেকে।

'জী, স্যার?'

'অর্ডার ভায়োলেশনটা মাফ করে দিলাম। নিশ্চিন্তে নেমে এসো নিচে। তোমাদের জীবিত দেখতে চাই আমি। কথাটা ভুলো না,' কঠোর কণ্ঠ রাহাত খানের।

হি হি করে হেসে উঠল সোহানা। 'শুনলে, রানা, মরবারও অর্ডার নেই আমাদের।'

জবাব না দিয়ে একটা বোতাম টিপল রানা অনুমানের উপর নির্ভর করে। দুলে উঠল গ্রেট ব্রিটেন। 'চললাম, আবার,' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

রাহাত খানের কণ্ঠ ভেসে এল অস্পষ্ট ভাবে, 'হোয়াট! কি বললে?'

'চললাম, স্যার।'

'কোথায়? কোন্ দিকে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ রাহাত খানের। খুবই অস্পষ্ট।

'জানি না···'

বোতামে হাত দিতে ভয় করছে রানার। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল নতুন করে।

ওয়্যারলেসের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

এয়ারক্র্যাফট ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে। কিন্তু কোন্‌দিকে তা বোঝার

উপায় নেই।

কুড়ি মিনিট পর স্পীডমিটার দেখে রানা বলল, 'সেকেন্ডে ছয় মাইল বেগে এগোচ্ছি আমরা।'

সোহানা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'রানা, ঘড়ি দেখো তো। সকাল হয়ে গেল নাকি!'

'কেন?' প্রশ্ন করল রানা অবাক হয়ে। ঘড়ি দেখল ও। বারোটা বাজতে দশ।

'টিভির পর্দার দিকে দেখো।'

রানা চেয়ে দেখল ভোর হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকায়। ক্রমে দুপুর হলো, সন্ধে হলো এবং তারপর আবার রাত হয়ে গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। যেন অ্যারাবিয়ান নাইট্সের কল্পনার জগতে ঢুকে পড়েছে ওরা।

কি করবে বুঝতে পারল না রানা। চুপচাপ বসে থাকলে এখন ছয় মহাদেশের উপর ঘুরতে থাকবে ওরা অনবরত। নামতে পারবে না। একটা কিছু করা দরকার। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে চিন্তা করল রানা, তারপর ভয়ে ভয়ে নতুন একটা বোতামে টিপ দিল। গতিপথ পরিবর্তন হলো শুধু, আর কোন ফল হলো না।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর মরিয়া হয়ে স্থির করল রানা, বড় হাতলটাই টান দেবে সে। যা হয় হোক। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আর থাকা যায় না। সোহানাকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে চোখ বন্ধ করে টান দিল রানা বড় হাতলটা। মিনিট খানেক চোখ খুলল না।

চোখ খুলে প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। পর মুহূর্তে চমকে উঠল রানা। টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে উঠেছে প্রত্যুষের প্রাকৃতিক দৃশ্য। ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে গাছ, মাঠ, নদী···

এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। টেনে তুলল সোহানাকে হাত ধরে। চোখের পলকে এয়ারক্র্যাফটের দরজা খুলে ফেলল ও। খুব ধীরে ধীরে ল্যান্ড করছে এয়ারক্র্যাফট। নিচেই নদী। দশ হাত বাকি থাকতেই লাফ দিল দু'জন হাত ধরাধরি করে। আফ্রিকার কুমীর ভর্তি লেম্পোপো নদী না হলেই হয়!

দশ মিনিটে তীরে পৌঁছে গেল ওরা। নদীতে স্রোতের টান বেশি নয়। কিন্তু বেশ গভীর বোঝা গেল ঢেউয়ের দোলা অনুভব করে। অনুচ্চ পাড়ে উঠে এল ওরা। ডুবে গেছে এয়ারক্র্যাফট পানির নিচে। কোন চিহ্ন নেই তার। মৃদুমন্দ বাতাসে শীত শীত লাগছে সোহানার।

'এটা কোন্ দেশ? পৃথিবী তো?' প্রশ্ন করল সোহানা অনুচ্চ কণ্ঠে।

ভোর হচ্ছে। একটা পাখি ডেকে উঠল। কেমন যেন পরিচিত ঠেকল ডাকটা। বোঝা গেল এটা পৃথিবীই। চারদিকে ভাল করে লক্ষ করল রানা। অন্ধকার কাটেনি, নদীর ওপারে ঘন জঙ্গল বলে মনে হচ্ছে। লোকালয় কাছেই, বোঝা গেল নদীর পাড়ে মানুষের বর্জ্য দেখে।

'রানা, আমরা বোধহয় অস্ট্রেলিয়ার কোন জঙ্গলে নেমেছি।'

রানার একটা হাত চেপে ধরল সোহানা অ্যাবরিজিন মানুষখেকোর ভয়ে।

'মাঝি বাইয়া যাওরে···' দূরে একটা নৌকার মাঝি গেয়ে উঠল গান। হো হো করে হেসে ফেলল রানা। 'না, এটা অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গল নয়, এটা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমার সোনার বাংলা।' নৌকাটা কাছে আসতেই হাঁক দিল সে, 'ও মাঝি, কই যাও?'

'এই তো সামনে ডেমরা।···অকুল দরিয়ার মাঝি আমার ভাঙা নাও···'

'তাহলে শেষ পর্যন্ত কোথায় ল্যান্ড করেছি আমরা?' লজ্জিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সোহানা।

'ডেমরা।' গম্ভীর রানার কণ্ঠ।

* * *